ভারত ও মধ্য-এশিয়া

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

ভারতী-ভবন
২৪।৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী
ভারতী-ভবন
২৪।৫।এ, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য এক টাকা
পাঁচ সিকা।

ভূমিকা

প্রাচীনকালে সমগ্র প্রাচ্য-জগৎ ভারতীয় সভ্যতায় দীক্ষিত হয়েছিল এবং সেই কারণে ইন্দো-চীন, যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ, মধ্য-এশিয়া, চীন, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি দেশ এখনো ভারতীয় সভ্যতার চিহ্ন সযত্নে বক্ষে ধারণ করছে। অথচ ভারতবর্ষ যে তার স্বকীয় সভ্যতার অনেক ধারা হারিয়ে ফেলেছে তা'তে সন্দেহ নাই। সেই সব ধারা—প্রাচ্য-জগতের নানা দেশ হ'তে হয়ত এখনও উদ্ধার করা সম্ভব, আর তা সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার না করতে পারলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে সম্যক্‌ভাবে অঙ্কিত হতে পারে না। প্রাচীন ইতিহাসের এই দিকে বাঙ্গালী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য কিছু দিন পূর্ব্বে 'ভারত ও ইন্দো-চীন' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করি এবং সে গ্রন্থে ইন্দো-চীনে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শনের পরিচয় দিয়েছি। 'ভারত ও মধ্য-এশিয়া'য় সেই ইতিহাসের আর একটী অধ্যায়ের বর্ণনা করছি, আর এ অধ্যায়ে মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার চিত্র অঙ্কন করতে চেষ্টা করেছি। এ প্রবন্ধ প্রথমে ধারাবাহিক ভাবে 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং এ প্রবন্ধকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার জন্য 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীকিরণকুমার

রায়ের নিকট হ'তে যে সহায়তা পেয়েছি সেজন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। "পরিশিষ্টে" যে প্রবন্ধটি সন্নিবেশিত হয়েছে, তা' পূর্ব্বে "রজত-জুবিলি" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। এ প্রবন্ধ হ'তে মধ্য-এশিয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ইতিহাস ও তার গ্রন্থসূচী দেওয়া হয়েছে।

এ বইয়ের দু'টি ভুল সংশোধন করা উচিত—১৭ পৃষ্ঠায় বিরূঢ়ককে মগধের রাজা বলেছি, তিনি ছিলেন কোশলের রাজা, আর ৮১ পৃষ্ঠায় ১২ লাইনে "পশ্চিম মুখে"র স্থানে "পূর্ব্বমুখে" হবে।

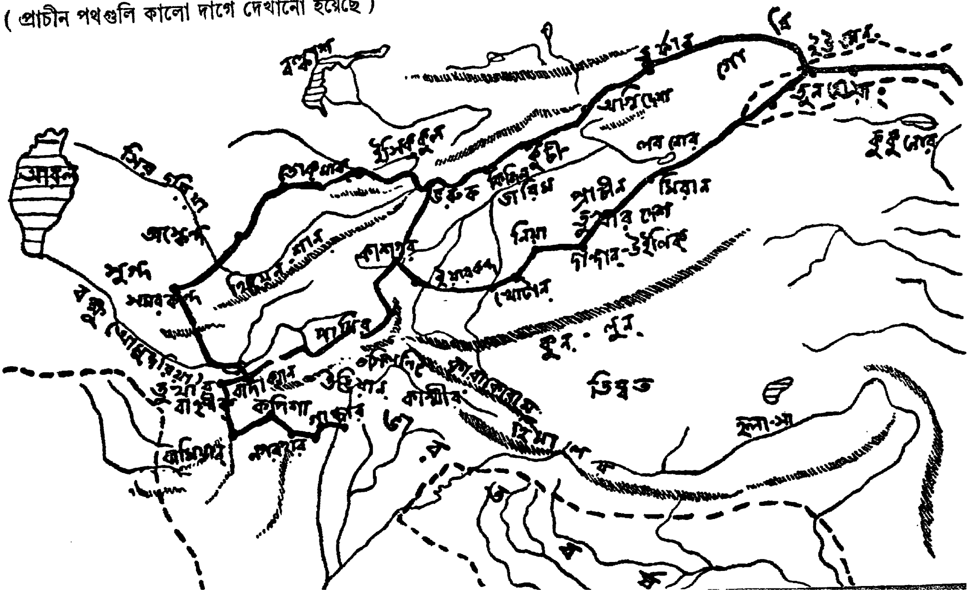
৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৩৭
কলিকাতা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

ভারত ও মধ্য-এশিয়া

মধ্য-এশিয়ার মানচিত্র

(প্রাচীন পথগুলি কালো দাগে দেখানো হয়েছে)



ভারত ও মধ্য-এশিয়া

পথ-ঘাটের কথা

এ কথা আমরা অনেকেই শুনেছি যে, প্রাচীন কালে ভারতীয় সভ্যতা বহু দূরদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল ও ভারতীয়েরা এ দেশের বাইরেও উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কোন্ দেশে, কি ভাবে ও কোন্ পথে সে সভ্যতা প্রসার লাভ করেছিল ও কি কি জাতি ভারতীয় সভ্যতায় দীক্ষিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে সত্যই আমাদের এখনো কোন স্পষ্ট ধারণা হয় নি।

সমুদ্রপথে ভারতীয় সভ্যতার ধারা প্রাচ্য দেশসমূহে, বিশেষতঃ ইন্দোচীনে, কম্বুজ ও চম্পায়, শ্যাম, যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে পৌঁছেছিল, সে কথা আমি "ভারত ও ইন্দোচীন" নামক বইয়ে বলেছি। স্থলপথে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ হ'তে সুরু করে সমস্ত মধ্য-এশিয়ায় কোন্ সময়ে ও কি ভাবে নূতন নূতন জাতির মধ্যে ভারতীয় কৃষ্টির বীজ বপন করা হয়েছিল, সেই কথা এই প্রবন্ধে

আলোচনা করব। কারণ সে ইতিবৃত্ত হচ্ছে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের একটি অবশ্য-জ্ঞাতব্য অধ্যায়, সে ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ-ভাবে অঙ্কিত না হলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস যে অসম্পূর্ণ থাকবে তা'তে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা যে দেশকে সাধারণতঃ মধ্য-এশিয়া বলি, মানচিত্রে তার আখ্যা দেওয়া হয়েছে প্রাচ্য-তুর্কিস্তান (**Eastern Turkestan**)। তার কারণ খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে এ দেশ তুর্কী বা তুরুস্ক জাতির হস্তগত হয়। কিন্তু এ দেশ বহু দিন সে জাতির অধীনে থাকলেও সেখানে বিভিন্ন জাতি বাস করত, বহু স্বাধীন রাজ্যের উত্থান-পতন হ'ত ও বিভিন্ন সভ্যতার ধারা সে দেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। তুর্কিস্তান এদেশের আসল নাম নয় বলে প্রাচীন ঐতিহাসিকেরা এ দেশকে কাশগরিয়া (**Kashgaria**) নামে অভিহিত করেছেন।

এ-দেশের পশ্চিম ও উত্তর সীমানায় থিয়েন-শান্ পর্ব্বত-মালা অবস্থিত, পশ্চিমে পামির ও কারাকোরাম ও দক্ষিণে কুন্-লুন্ পর্ব্বতশ্রেণী। পূর্ব্বদিকে এ-দেশ চীনের সীমান্তবর্ত্তী পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যস্থলে গোবি মরুভূমির যে বিস্তৃত মরুশাখা অবস্থিত বর্ত্তমান কালে তার আখ্যা দেওয়া হয়েছে তারিম অথবা তাক্লামাকন্। এই মরুভূমিই এ

দেশের আবহাওয়াকে শুষ্ক করে তুলেছে এবং সেই জন্য মরুভূমির চতুর্দ্দিকে যে সব জনপদ অবস্থিত, সেগুলি অনুর্ব্বর। মধ্য-এশিয়ার উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের পর্ব্বত-শ্রেণী হ'তে জল আহরণ করে দুটি নদী প্রবাহিত। এই দুই নদীর নাম কাশগর-দরিয়া ও ইয়ারকন্দ-দরিয়া। এই দুই নদী মধ্যপথে একত্র মিলিত হয়ে মধ্য-এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভাগে লব-নোর (লবণ-হ্রদ) নামক হ্রদে পতিত হয়েছে। দুই নদীর সমবেত ধারা তারিম (Tarim) নামে অভিহিত হয়, এই নদীকেই খুব সম্ভব আমাদের পুরাণকারেরা সীতা নদী নামে উল্লেখ করেছেন। নদীগুলি তা'দের উৎপত্তিস্থলে জলপূর্ণ থাকলেও মরুভূমির নিকটবর্ত্তী স্থানে শুষ্কপ্রায়।

এ দেশে বৃষ্টিপাত অতি অল্প, সে বৃষ্টিধারাও বহুস্থানে মরুভূমির তপ্ত হাওয়ায় মিশিয়ে যায়, আর শীতকালে সাইবিরিয়া হতে উত্তরে হাওয়া এমন প্রচণ্ড-ভাবে বইতে থাকে যে, এ দেশে মানুষের জীবন-যাত্রা কষ্টকর হয়ে ওঠে। হাওয়ার তাপ তখন প্রায়ই—৩৫° ডিগ্রীতে দাঁড়ায়। আবহাওয়ার এই অত্যাচারে এই বিস্তৃত দেশের জনসংখ্যা ২০ লক্ষের বেশী নয়, অথচ দেশের বিস্তৃতি বাংলা দেশের চাইতে অনেক বেশী।

মধ্য-এশিয়ায় জনপদ ও নগরগুলি মরুভূমির উত্তর ও

দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত। দক্ষিণে ইয়ারকন্দ, খোটান ; উত্তরে মারালবাশি, কুচার, কারাশর, তুর্ফাণ ইত্যাদি। এ দেশের দুটি প্রধান পথ এই দুই সীমান্ত বেয়ে চীন দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিম প্রান্তে এ দুটি পথ মিলিত হয়েছে কাশগরে, আর পূর্ব্বপ্রান্তে চীনদেশের সীমান্তবর্ত্তী ইউ-মেন-কোয়াং নামক গিরিপথে। আর একটি ছোট পথ মরুভূমির মধ্য দিয়ে ইয়ারকন্দ-দরিয়ার ধারা বেয়ে উত্তরবাহী পথের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই দুই পথে প্রাচীনকালে মধ্য-এশিয়ার সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য চলত এবং বর্ত্তমানেও তাই চলে। তা ছাড়া পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহ অর্থাৎ পারস্থ, আফগানিস্থান, সমরকন্দ প্রভৃতি স্থানের সহিত প্রাচীনকালে চীনসাম্রাজ্যের যোগ-সূত্র মধ্য-এশিয়ার এই পথেই স্থাপিত হয়েছিল।

মধ্য-এশিয়ার এপথে বিদেশীর যাতায়াত ঠিক কোন্ সময়ে সুরু হয় তা বলা যায় না। চীনা ইতিহাসে যে সব নির্দ্দেশ রয়েছে, তা' থেকে জানা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে চীনজাতির চিরশত্রু হূণদিগকে মধ্য-এশিয়া হ'তে বিতাড়িত করবার জন্য চীন সরকার ইউ-চি বা কুশাণদের সহায়তা লাভের জন্য এক দূত প্রেরণ করেন। কুশাণরাজারা তখনও ভারতবর্ষ জয় করে নি, মধ্য-এশিয়া হতে হূণজাতি দ্বারা বিতাড়িত হয়ে অক্সাস্ বা আমুদরিয়ার উপত্যকায়

বাহ্লীক (Bactria) দেশে রাজ্য বিস্তার করেছে। চীনদূত চাং-খিয়েন্ হূণদের হাতে নানাভাবে লাঞ্ছিত হয়ে অবশেষে কুশাণদের রাজধানীতে উপনীত হলেন। কুশাণরাজ হূণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অসম্মত হওয়ায় চাং-খিয়েন খৃষ্টপূর্ব্ব ১২৫ সালে চীনদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন—কিন্তু তিনি মধ্য-এশিয়ার নানা সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ও পথঘাটের খবর রাজ-সরকারে পেশ করলেন। সেই সঙ্গে চাং-খিয়েন ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও নানা সংবাদ দিলেন এবং চীন-সম্রাটকে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে অনুরোধ করলেন। এর কিছু-কাল পরেই হূণজাতি চীনাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করল ও মধ্য-এশিয়ার পথঘাট চীনাদের হস্তগত হ'ল। এই পথঘাট লোক-যাতায়াতের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখবার জন্য মধ্য-এশিয়ার দুটি প্রধান পথের ধারে চীনসরকার ছোট ছোট দুর্গ ও সেনা-নিবাস (military out-posts) স্থাপন করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বিদেশী বণিক, পরিব্রাজক ও ধর্ম্মযাজকেরা এই পথ দিয়ে চীনদেশ পর্য্যন্ত নিয়মিত যাতায়াত সুরু করল।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত তখন কুশাণদের হস্তগত হয়েছে এবং কুশাণদের প্রমুখাৎ ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু মধ্য-এশিয়ার নানা জাতি ও চীনদেশের খবর পেয়েছেন।

খৃষ্টপূর্ব্ব ২ সালে কুশাণরাজারা চীন-সম্রাটকে বৌদ্ধশাস্ত্র উপহার দিলেন এবং সেই জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে চীনাপণ্ডিত-দের ঔৎসুক্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হ'ল। এই সব কারণে খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে চীন দেশের এবং সেই ব্যপদেশে মধ্য-এশিয়ার নানা জাতির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হ'ল ও ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মধ্য-এশিয়ার নানাদেশে ছড়িয়ে পড়লেন। যে সব ভারতীয় ভিক্ষু বিভিন্ন যুগে চীনদেশে গিয়েছিলেন ও যে সব চীনা শ্রমণ ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তাঁদের জীবনী থেকে আমরা সেকালের পথ-ঘাটের অনেক সন্ধান পাই।

দু'জন ভারতীয় ভিক্ষুর চীনা ভাষায় লিখিত জীবনীতে এ পথঘাট সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। সে দু'জন ভিক্ষু হচ্ছেন জিনগুপ্ত ও ধর্ম্মগুপ্ত। জিনগুপ্ত ৫২২ খৃষ্টাব্দে গান্ধার দেশের রাজধানী পুরুষপুর (বর্ত্তমান পেশোয়ার) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে ছিলেন ক্ষত্রিয় ও যে বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে বংশ 'কম্বু' নামে খ্যাত ছিল। তাঁর পিতা বজ্রসার ছিলেন গান্ধার দেশের একজন প্রধান মন্ত্রী। জিনগুপ্ত অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হ'লেন এবং কিছুকাল পরেই তাঁর উপাধ্যায় জিনযশার নিকট শাস্ত্র-শিক্ষা ও আচার্য্য জ্ঞানভদ্রের নিকট সাধন-

শিক্ষা আরম্ভ হ'ল। কিছুকাল পরে জিনগুপ্ত আচার্য্য ও সহাধ্যায়ীদের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচার-কল্পে বিদেশ-যাত্রা করেন। তাঁদের দলে ছিল ১০ জন ভিক্ষু—সকলেই অজ্ঞাত পথের কষ্ট-স্বীকারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পুরুষপুর হ'তে রওনা হয়ে ধর্ম্মগুপ্ত ও তাঁর সঙ্গীরা কুভা বা কাবুল নদীর উপত্যকা বেয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে চললেন ও নগরহার (বর্ত্তমান জেলালাবাদ) অতিক্রম করে কপিশা দেশে পৌঁছিলেন। কপিশা রাজ্য এ সময়ে ছিল গান্ধার অপেক্ষাও সমৃদ্ধিশালী, তার কারণ ভারতবর্ষ থেকে উত্তরবাহিনী প্রধান পথ কপিশা হয়ে বাহ্লীক ও অন্যান্য দেশে পৌঁছেছে। সুতরাং নানা দেশের বণিকদের কপিশা ছিল **emporium** বা সরবরাহের স্থান। কপিশায় তখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল, রাজা স্বয়ং বৌদ্ধ, সুতরাং ধর্ম্মগুপ্ত ও তাঁর অনুচরেরা রাজদরবারে বিশেষভাবে সমাদৃত হলেন। কপিশা হচ্ছে সেই দেশ বর্ত্তমান কালে যাকে কাফিরিস্তান বলা হয়, এদেশ থেকে হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করবার তিনটি প্রসিদ্ধ গিরিপথ আছে—পাঁজশির নদীর উপত্যকা, কুশান উপত্যকা এবং আরও পশ্চিমে বামিয়েন উপত্যকা। ধর্ম্মগুপ্ত এই তৃতীয় পথে কপিশা পরিত্যাগ করে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের পশ্চিম পাদদেশ অতিক্রম করে হূণদের (যাদের ইতিহাসে বলা হয় **Whiet**

Huns বা Hepthalites) দেশে আগমন করলেন। এদেশে জনপদ বিরল, লোকের বসবাস অল্প এবং সেই জন্য জিনগুপ্ত ও তাঁর সহচরদের আশ্রয়ের অভাবে এ দেশে পথ চলা বিশেষ কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল। এই হূণ রাজ্য অবস্থিত ছিল বাদাক্সান (Badakshan) ও ওয়াখান (Wakhan) অঞ্চলে। পুরাণ ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে যে সব ভৌগোলিক বৃত্তান্ত রয়েছে তা'তে এ রাজ্যকে বোক্কন (বর্ত্তমান Wakhan) নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ অঞ্চল পরিত্যাগ করে নানা দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করে জিনগুপ্ত পামিরের অন্তঃপাতী একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে উপস্থিত হলেন। এ রাজ্য প্রাচীন চীনা ইতিহাসে কো-লো-পান্-তো নামে উল্লিখিত হয়েছে। বর্ত্তমান তাশ-কুরগান্ (Tash Kurghan) যেখানে অবস্থিত এ রাজ্যের প্রাচীন রাজধানীও সেই অঞ্চলে অবস্থিত ছিল।

এই পথে জিনগুপ্ত অনুচরদের সঙ্গে তুষারাবৃত পর্ব্বত অতিক্রম করে খোটানে (Khotan) পৌঁছুলেন। খোটান সে সময়ে মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থানীয় সমৃদ্ধিশালী নগর। খোটানের বৌদ্ধবিহারে কিছুকাল অবস্থান করে ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনার পর মধ্য-এশিয়ার দক্ষিণবাহী পথে জিনগুপ্ত চীন যাত্রা করেন।

জিনগুপ্তের চীন যাত্রার কিছুকাল পরেই আর একজন ভারতীয় শ্রমণ যে পথ অনুসরণ করে মধ্য-এশিয়া হয়ে চীন দেশে গমন করেন, সে পথের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাও আমরা তাঁর চীনা জীবনীতে পাই। ধর্ম্মগুপ্ত কাথিয়াওয়াড়ের অন্তঃপাতী লাট দেশের লোক। ২৩ বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন ও বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে কান্যকুব্জ নগরে কৌমুদী-সংঘারাম নামক বৌদ্ধবিহারে শাস্ত্রাধ্যায়ন করেন। অধ্যয়ন সমাপ্ত করে তিনি তাঁর আচার্য্যের সঙ্গে বিদেশ-ভ্রমণে বহির্গত হলেন। কান্যকুব্জ হ'তে তাঁ'রা প্রথমে টক্কদেশে গমন করেন—টক্কদেশ হচ্ছে পঞ্জাবের উত্তর অঞ্চলের প্রাচীন নাম। এ দেশের রাজধানী ছিল শাকল (বর্ত্তমান শিয়ালকোট)। টক্কদেশে দেববিহারে তাঁরা ৫ বৎসরকাল অতিবাহিত করে চীন যাত্রা করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তদেশ হ'তে তাঁরা যে পথ ধরলেন, সে হচ্ছে সেই একমাত্র পথ, যা' পেশোয়ার থেকে কুভা নদীর ধার বেয়ে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে গিয়েছে। এ পথে তাঁরা প্রথমে কপিশায় উপস্থিত হলেন—কপিশার রাজার স্থাপিত বৌদ্ধবিহারে তাঁরা দু' বৎসর শাস্ত্রালোচনায় অতিবাহিত করলেন। কপিশা হ'তে পশ্চিমমুখী গিরিপথ অতিক্রম করে তাঁরা প্রথমে ফু-খিয়া-লো (=বাহ্লীক), পো-তো-ছান-না (=বাদাক্সান), কো-লো-পান্-তো (=তাশ-কুরগান্)

প্রভৃতি দেশ হয়ে পামিরের দুর্লঙ্ঘ্য গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে শা-লেই (=শৈল-দেশ) বা কাশগরে উপস্থিত হলেন। কাশগরের বৌদ্ধবিহারে তাঁরা দু' বৎসর স্থানীয় ভিক্ষুদের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা ও শাস্ত্রাধ্যায়নে অতিবাহিত করলেন। কাশগর পরিত্যাগ করে তাঁ'রা দক্ষিণ-পূর্ব্ববাহিনী পথ অনুসরণ না করে থিয়েন-শান্ পর্ব্বতের পাদদেশ দিয়ে উত্তর-পশ্চিমবাহী পথ অনুসরণ করলেন। এই পথে তাঁরা প্রথমে যে দেশে প্রথম উপস্থিত হলেন, সে হচ্ছে কুচার (প্রাচীন কুচা বা কুচী)। কুচায় ২ বৎসর অতিবাহিত করে তাঁরা চীন দেশাভিমুখে রওনা হলেন। পথে তাঁরা উ-কি (=অগ্নিদেশ, বর্ত্তমান কারাশর), কাও-ছাং (বর্ত্তমান তুর্ফাণ) ও নিকটবর্ত্তী নানা স্থানে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করে চীনদেশে গমন করেন।

ভারতবর্ষ থেকে আরও অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু এই সব পথে চীনদেশে গিয়েছিলেন, তাঁদের সকলের জীবনীই চীনা সাহিত্যে সংরক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সে সব জীবনীতে এ সব পথ-ঘাটের উল্লেখ অল্প। অথচ যে সব চীনা ভিক্ষু চীনদেশ হতে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তাঁরা স্বদেশে গিয়ে নানা দেশের যে বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন, তাতে পথঘাটের পরিচয় আরও সুস্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে।

যে সব চীনা পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসেন, তাঁদের মধ্যে ফা-হিয়েন প্রথম। ফা-হিয়েন খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ-ভাগে স্বদেশ ত্যাগ করে মধ্য-এশিয়া ও ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন ও ৪১৬ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। যে পথ হয়ে তিনি ভারতবর্ষে আসেন, সে একটি নূতন পথ। মধ্য-এশিয়ার উত্তরবাহী পথ অনুসরণ করে তিনি অগ্নিদেশ (উ-কি, বর্ত্তমান কারাশর) পর্য্যন্ত আসেন, কিন্তু এ পথে তিনি আর পশ্চিমমুখে অগ্রসর না হয়ে সোজা মরুভূমি অতিক্রম করে খোটানে উপস্থিত হন। এই মরু-ভূমির পথ কোন যুগেই সুগম ছিল না, এ পথে কিছুদূর তারিম নদীর ধার বেয়ে আসা যায় বটে, কিন্তু বেশী পথই মরু-ভূমির মধ্য দিয়ে। ফা-হিয়েনের কথাতেই এই পথের বর্ণনা করা ভাল—"এ ভূমিভাগে মানুষের চিহ্ন নাই। এ পথে নদী পার হওয়া ও মরুভূমি অতিক্রম করা কি দুঃসাধ্য, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এই সামান্য পথ অতিক্রম করে খোটান পৌঁছিতে ৩৫ দিন লাগল।" খোটানের প্রসিদ্ধ গোমতী-বিহারে কিছুকাল শাস্ত্রাধ্যায়ন করে ফা-হিয়েন ভারত-বর্ষের যে পথ গ্রহণ করলেন, সে পথেও সাধারণতঃ লোক যাতায়াত করত না, কারণ সে পথ ছিল বিশেষ কষ্টসাধ্য। এ পথে তাঁরা দুরারোহ পর্ব্বত আরোহণ করে, বহু গভীর

পার্ব্বত্য নদী অতিক্রম করে দরদ বা বর্ত্তমান দারেল উপত্যকায় এসে উপনীত হলেন। দরদ হ'তে সিন্ধু নদীর উপত্যকা বেয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করবার পথ, এ পথে নদী অতিক্রম করতে হল ঝুলানো দড়ীর সেতু (suspension bridge of ropes) বেয়ে।

খোটান হ'তে এ পথে ভারতবর্ষে আসতে হলেও পামির অতিক্রম করতে হয়, কিন্তু তাশ-কুরগান্ হতে পশ্চিমমুখে বাদাক্সান না গিয়ে অন্য গিরিপথ দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব্বে গিলগিট (Gilgit) নদীর উপত্যকা হয়ে সিন্ধু নদীর উপত্যকায় পৌছান যায়। এ পথ অত্যন্ত দুর্গম। হয়ত এই পথের বর্ণনাই আমরা পালি বৌদ্ধ-সাহিত্যে ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে পাই। পালি সাহিত্যে এ পথের বিভিন্ন অংশকে বলা হয়েছে—জন্নুপথ (যে পথ জানু দিয়ে অতিক্রম করতে হয়, পায়ে চলা যায় না), অজপথ ও মেণ্ঢ পথ (যে সব পথ শুধু ছাগল ও ভেড়া অতিক্রম করতে পারে), বংশপথ (যে সব পথ বাঁশের সেতুতে অতিক্রম করতে হয়), শকুন-পথ, মূষিক-পথ, দরিপথ (দরি=গুহা), শঙ্কুপথ, বেত্রপথ ইত্যাদি। এই পথের কথাই হয়ত রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ণিত হয়েছে—"সে দেশে শৈলোদা নদী অতিক্রম করতে হলে পরপারের কীচক যখন

বাতাসে হেলে পড়ে, তখন সেই কীচকের অগ্রভাগ ধরে নদীর অন্য পারে অবতীর্ণ হওয়া যায়"* ।

এ সব পথ ছাড়া মধ্য-এশিয়ায় প্রবেশ করবার আর একটি পথ ছিল। সে পথে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগ বিরল হলেও ইউরোপ, পারস্য, সমরকন্দ প্রভৃতি অঞ্চল হতে মধ্য-এশিয়ায় প্রবেশ করবার সেইটী ছিল প্রশস্ত পথ। এ পথে ঐ সব দেশের সঙ্গে মধ্য-এশিয়া ও চীন দেশের বাণিজ্য চলত, তা ছাড়া যে সব জাতি মধ্য-এশিয়া থেকে প্রাচীনকালে পশ্চিম-এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল তারাও এই প্রশস্ত পথেই যাতায়াত করেছিল। এ পথের বর্ণনা পাই চীনা পরিব্রাজক হিউয়ান-সাং-এর গ্রন্থে। হিউয়ান-সাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমে ভারতবর্ষে রওনা হন, তখন মধ্য-এশিয়ার দক্ষিণ ভাগ তুর্কীদের করতলগত হয়েছে, আর সে তুর্কীদের সঙ্গে চীনের তখনও কোন রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নি। এই কারণেই হিউয়ান-সাং মধ্য-এশিয়ার দক্ষিণ-বাহী পথে ভারতবর্ষে আসতে পারেন নি। তিনি উত্তর প্রান্ত দিয়ে,

* তং তু দেশমতিক্রম্য শৈলোদা নাম নিম্নগা।
উভয়োস্তীরয়োস্তস্যাঃ কীচকা নাম বেণবঃ।
সা ন শক্যা তরীতুং হি নদী পরমদুর্গমা।...
তে নয়ন্তি পরং তীরং সিদ্ধান্ প্রত্যানয়ন্তি চ ॥

কুচার (প্রাচীন কুচী) পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়ে অন্য পথ ধরতে বাধ্য হলেন তার কারণ কুচার হতে কাশগর পর্য্যন্ত যে সোজা রাস্তা তা' তখন তুর্কীদের করতলগত। কুচার হ'তে তিনি উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে রওনা হয়ে বেদল গিরিপথ (Bedal Pass) বেয়ে থিয়েন-শান্ পর্ব্বত অতিক্রম করলেন। তারপর ইস্‌সিক-কুল হ্রদের (Issik Kul) পাশ দিয়ে ও থিয়েন-শান্ পর্ব্বতের উত্তর পাদদেশ বেয়ে তিনি যে পথে বাহ্লীক (Balkh) অভিমুখে রওনা হলেন সে পথ বর্ত্তমান তাস্কেন্দ (Tash-kend), সমরকন্দ হয়ে, আমুদরিয়া (প্রাচীন বক্ষু, Oxus) অতিক্রম করে কুন্দুজ (Kunduz) নামক স্থানে অন্যান্য পথের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এর পর বাহ্লীক, কপিশা প্রভৃতি দেশ হয়ে আমরা পূর্ব্বে যে পথের উল্লেখ করেছি সেই পথ অনুসরণ করে হিউয়ান-সাং ভারতবর্ষে আসেন।

সপ্তম শতকের মধ্যভাগে তিব্বতের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রথম যোগসূত্র স্থাপিত হয়। তিব্বতের পথে ভারতীয়দের যাতায়াত সহজসাধ্য না হলেও অনেক বৌদ্ধভিক্ষু যে সে পথে মধ্য-এশিয়া হয়ে চীন দেশ গিয়েছিলেন তার প্রমাণ চীনা সাহিত্যেই পাওয়া যায়।

মধ্য-এশিয়ার প্রান্তভূমি

আমরা ইতিপূর্ব্বে যে পথঘাটের পরিচয় দিয়েছি, তা' থেকে বোঝা যাবে যে, সেকালে ভারতবর্ষ হ'তে মধ্য-এশিয়া যাবার সব চাইতে প্রশস্ত পথ ছিল, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পুরুষপুর (বর্ত্তমান পেশোয়ার) থেকে কুভা (বর্ত্তমান কাবুল) নদীর তীর বেয়ে। এই পথে যেতে হ'লে আমরা এখন যে দেশকে আফগানিস্তান বলি, সেই দেশ অতিক্রম করতে হ'ত। এ দেশ বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও সেকালে ছিল ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত। যে-বৈদিক যুগে ভারতীয় আর্য্যদের বহু শাখা কুভা নদীর উপত্যকায় বসবাস করতেন, সে যুগের কথা বাদ দিলে, পরবর্ত্তী কালেও ভারতের সঙ্গে এ-দেশের যোগসূত্র শিথিল হয় নাই।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে যখন হিউয়ান-সাং এ পথে ভারতবর্ষে আসেন, তখন এ দেশ নানা ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত; এ সব রাজ্যের মধ্যে কপিশা তখন শীর্ষস্থানীয়; অন্যান্য রাজ্যগুলি—গান্ধার, নগরহার, লম্পাক, উড্ডিয়ান প্রভৃতি কপিশার আধিপত্য স্বীকার করেছে। অথচ কপিশা তখনও সম্পূর্ণ ভাবে ভারত-বর্ষের অন্তর্ভুক্ত; সে দেশের রাজা ক্ষত্রিয়, বৌদ্ধধর্ম্মে তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, প্রতি বৎসর তিনি বুদ্ধের বিরাট রজতময়ী মূর্ত্তি বৌদ্ধ-

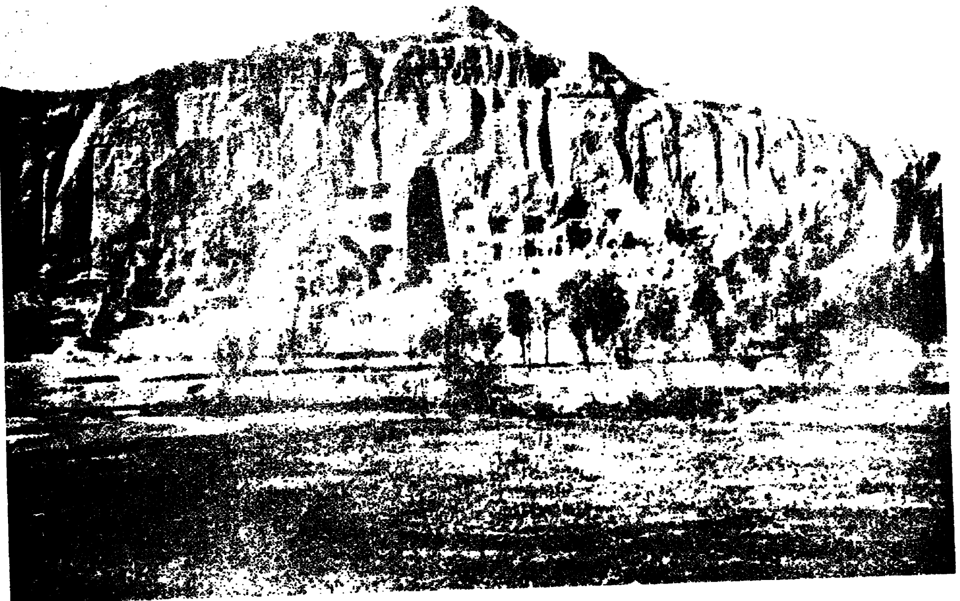
সংঘকে দান করেন ও বার্ষিক মোক্ষপরিষদে অক্লান্তভাবে ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেন। কপিশার রাজধানীতে বৌদ্ধ-বিহারের সংখ্যা তখন এক শত ও বৌদ্ধভিক্ষুর সংখ্যা অন্যূন ছয় হাজার। হিন্দুকুশের পাদদেশে অবস্থিত এই সুদূর কপিশানগরীতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকেও ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। সেখানে দেবমন্দিরের সংখ্যা খুব অল্প ছিল না, ও দিগম্বর জৈন, পাশুপত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরাও কপিশাতে বাস করত। নগরহার (বর্ত্তমান জেলালাবাদ) ও লম্পাক (বর্ত্তমান লামঘান) গান্ধার হ'তে কপিশা পর্য্যন্ত যে পথ গিয়েছে, সেই পথের উপরই অবস্থিত ছিল। সে সব দেশের প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষাও যে ভারতীয় ছিল, তার প্রমাণ সে দেশের মাটি খুঁড়েই পাওয়া গিয়েছে। জেলালাবাদ অঞ্চলে প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে প্রাচীন শিল্পের যে নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, তা' ভারতীয় শিল্পের ধারাই সম্পূর্ণ ভাবে অনুসরণ করেছিল।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, কপিশা থেকে তিনটি গিরিপথের যে-কোনটি অবলম্বন করে সেকালে বাহ্লীক বা Bactria দেশে পৌছান যেত। সব চাইতে প্রশস্ত ছিল, দক্ষিণ-পশ্চিমের গিরিপথ, যাকে বামিয়েন (Bamiyan) বলা হয়। বামিয়েন নাম আধুনিক নয়, কারণ সপ্তম শতকের চীনা বিবরণে এ স্থান

বাম-ইয়েন-না (বামিয়েন্ন) বা বাম্-ইয়েন (বামিয়েন) নামেই উল্লিখিত হয়েছে। কাবুল হতে ঘোরবান্দ নদীর ধার বেয়ে বামিয়েন পৌঁছান যায়, বামিয়েনের বিস্তৃত উপত্যকায় এক সময়ে একটি সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের রাজধানী অবস্থিত ছিল। বৌদ্ধ-সাহিত্যের কিংবদন্তী যদি বিশ্বাস করতে হয়, তা হ'লে মানতে হবে যে, বহু প্রাচীনকাল হ'তেই কপিলাবস্তুর শাক্য-রাজারা এখানে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন। মগধের রাজা বিরুঢ়ক এক সময়ে শাক্যবংশ কর্ত্তৃক অপমানিত হ'ন। তিনি কপিলাবস্তু আক্রমণ করেন ও শাক্যবংশ ধ্বংস করেন। শাক্য-বংশের এ ভাবে বিধ্বস্ত হ'বার কারণ যে, শাক্যরা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল এবং এ-ধর্ম্মে যখন জীবহিংসা নিষিদ্ধ, তখন যুদ্ধ করাও নিষিদ্ধ। এই জন্যই বৌদ্ধ শাক্যপুত্রেরা যুদ্ধ হ'তে নিরস্ত হ'ন। কিন্তু, এই বংশের চারজন রাজপুত্র সে-নিষেধাজ্ঞা না মেনে সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধ করেন এবং সেই কারণে তাঁরা সমাজচ্যুত হয়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই চারজন শাক্য-পুত্রের মধ্যে একজন উড্ডিয়ানের ও আর একজন বামিয়েনের রাজা নির্ব্বাচিত হ'ন। উড্ডিয়ানের সেই শাক্যরাজবংশের একজন বংশধর খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন ও পরে চীন দেশে ধর্ম্ম প্রচার করতে যান। তাঁর নাম বিমোক্ষসেন; তিনি ৫৪১ খৃষ্টাব্দে অন্যান্য ভারতীয় ভিক্ষুদের

সহায়তায় ছয়খানি সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনূদিত গ্রন্থগুলি চীনা বৌদ্ধত্রিপিটকে এখনও সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে।

কপিশার মত বামিয়েন ছিল নানাদেশীয় বণিকদের কেন্দ্র-স্থান, কারণ হিন্দুকুশের উত্তরে যে সব রাজ্য ছিল, বিশেষতঃ সুগ্দ, পারস্য, সমরকন্দ, বাহ্লীক—সে সব দেশের বণিকেরা ভারতবর্ষের পথে, হয় বামিয়েন না হয় কপিশাতে অস্থায়ী বা স্থায়ী ভাবে বসবাস করত। ভারতীয় বণিক এবং ধর্ম্মযাজকও সেই কারণেই এই দুই স্থানের সঙ্গে পরিচিত ছিল। হিন্দুকুশের উত্তরে ভারতীয় সভ্যতা প্রসার লাভ করেছিল সেই সব বণিক ও ধর্ম্মযাজকদের চেষ্টায় এবং সেই প্রচারকার্য্যে বামিয়েনের বৌদ্ধবিহারের ভিক্ষুরা যে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকেও বামিয়েনের রাজারা ছিলেন সেই প্রাচীন শাক্যবংশের বংশধর এবং তাঁদের ধর্ম্ম ছিল বৌদ্ধধর্ম্ম। বামিয়েনের রাজধানীতে বহু বৌদ্ধবিহার তখন সহস্রাধিক বৌদ্ধভিক্ষুতে পরিপূর্ণ। উপত্যকার পূর্ব্ব-পশ্চিম দিকে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের ধার কেটে বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়েছিল, সে সব মূর্ত্তির মধ্যে দু' একটি প্রায় ১৫০ ফুট উঁচু। এই পর্ব্বতের ধারে অজন্তার অনুকরণে যে-সব গুহা-মন্দির নির্ম্মিত হয়েছিল—সেগুলি ছিল বৌদ্ধভিক্ষুদের নীরবে সাধনা ও



বামিয়ান উপত্যকার পাহাড়ের গায়ে প্রাচীন গুহা-মন্দির (পৃঃ ১৮)



অজন্তায় প্রাচীর-চিত্র : বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি (পৃঃ ২১)

অধ্যয়ন করবার স্থান। বামিয়েনে বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতীয় সভ্যতা লোপ পাবার বহু শতাব্দী পরে এ সব মন্দিরের কোন খোঁজ কেউ জানত না, কিন্তু সম্প্রতি ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এগুলির পুনরাবিষ্কার করেছেন ও সেই সব গুহায় প্রাচীন যুগের যে সব নিদর্শন লুক্কায়িত ছিল, তা'র উদ্ধার সাধন করেছেন।

এই সব গুহামন্দিরে নানা যুগের সংস্কৃত পুঁথির খণ্ডিতাংশ পাওয়া গিয়েছে। এসব পুঁথি বৌদ্ধশাস্ত্রের, কিন্তু লিপি ও ভাষা ভারতীয়। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুঁথি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের, অর্থাৎ কুশাণযুগের। এ পুঁথির লিপি হচ্ছে সেই ব্রাহ্মীলিপি, যা খৃষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে উত্তর-ভারতে প্রচলিত ছিল। এই যুগের লিখিত পুঁথি ভারত-বর্ষের কোন প্রদেশে এখনো পাওয়া যায় নি। গুপ্তযুগে অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে লিখিত সংস্কৃত পুঁথির অংশও এই সব গুহায় পাওয়া গিয়েছে। এ সব পুঁথি বেশীর ভাগই হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল-সর্ব্বস্তিবাদ সম্প্রদায়ের বিনয়-পিটকের অন্তর্গত।

বৌদ্ধধর্ম্ম এক সময়ে আঠারোটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তার মধ্যে সর্ব্বাস্তিবাদ ও মূল-সর্ব্বাস্তিবাদ হচ্ছে দুইটি প্রধান সম্প্রদায়। এ দুইটি সম্প্রদায় উদ্ভূত

হয়েছিল কাশ্মীরে এবং গান্ধার হ'তে আরম্ভ করে চীন পর্য্যন্ত যে-সব দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসার লাভ করেছিল, প্রায় সর্ব্বত্রই সর্ব্বাস্তিবাদ এবং তিব্বত ও অন্য দুই একটি দেশে মূল-সর্ব্বাস্তি-বাদ অনুসৃত হয়েছিল। এ দুই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র ছিল সংস্কৃত ভাষায় ; সে শাস্ত্রের মূল এখন লুপ্তপ্রায়। সমগ্র শাস্ত্র হয় চীনা, না হয় তিব্বতী অনুবাদে এবং মূলের খণ্ডিত পুঁথির অংশবিশেষ হয় নেপালে, না হয় মধ্য-এশিয়ার নানা স্থানে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছে।

বামিয়েনে যে-সব পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে কতক-গুলি ভারতীয় লিপির এমন একটি বিশেষ ভঙ্গীতে লিখিত, যা'কে বলা হয় বক্র-গুপ্ত (Slanting Gupta)। এই লিপির মূল হচ্ছে সেই লিপি, যা খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে অর্থাৎ গুপ্ত-যুগে উত্তর-ভারতে প্রচলিত ছিল। এই লিপি মধ্য-এশি-য়ার নানাস্থানে যখন গৃহীত হ'ল, তখন তার রূপ সামান্য পরি-বর্ত্তিত হয়। সেই কারণে মধ্য-এশিয়ার লিখিত পুঁথি তার অক্ষর থেকেই চেনা যায়। বামিয়েনের গিরিগুহায় মধ্য এশিয়ার প্রচলিত লিপিতে লিখিত পুঁথি দেখে মনে হয় ও-পুঁথি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত বণিক কিংবা ধর্ম্মযাজক বাইরের দেশ থেকে নিয়ে এসেছিল।

বামিয়েনের গুহা-মন্দিরে শিল্পের যে-সব নিদর্শন আবিষ্কৃত

হয়েছে, তা দেখলে অবাক হ'তে হয়। হিউয়ান-সাং যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তার সত্যতা সম্বন্ধে, আর কোন সন্দেহ থাকে না। পাহাড়ের ধার কেটে যে-সব বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়েছিল, তা এখন হতশ্রী হ'লেও দর্শকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করে। এর মধ্যে কতকগুলি মূর্ত্তির উচ্চতা প্রায় ৯০ ফুট। গুহা-মন্দিরে যে সব প্রাচীর-চিত্রের নমুনা সংগৃহীত হয়েছে, তা দেখলে মনে হয়, এ অঞ্চলে যে শিল্প প্রচলিত ছিল, তা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ধারাই অনুসরণ করেছিল। প্রাচীর-চিত্র অজন্তার চিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়; এ চিত্রের বিষয়বস্তু, পরিকল্পনা, ও রচনা-ভঙ্গী সম্পূর্ণভাবে অজন্তার অনুরূপ। কিছু স্থানীয় প্রভাব তার ভিতর আছে বটে, কিন্তু তা অতি সামান্য। বামিয়েনের এই শিল্প কোন্ সময় উৎকর্ষ লাভ করেছিল, তা সঠিক জানা না গেলেও অনুমান হয় যে, গুহা-মন্দিরগুলি খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে নির্ম্মিত হয়েছিল। বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তিগুলিও ঐ যুগের। এ অনুমানের কারণ হচ্ছে যে, ঠিক ঐ যুগেই ভারতবর্ষে অজন্তা এবং মধ্য-এশিয়ায় কুচার তুন্-হোয়াং প্রভৃতি স্থানে অনুরূপ ধারা অনুসরণ করে একই অনুপ্রেরণায় বহু গুহা-মন্দির নির্ম্মিত হয়।

এ সব নিদর্শন থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, বামিয়েন ভারতীয় সভ্যতার কত বড় কেন্দ্র ছিল। তার শিক্ষা, দীক্ষা

শিল্প, সাহিত্য, সমস্তই ছিল ভারতীয় এবং ভারতীয় রাজবংশ সেখানে রাজত্ব করত।

বামিয়েন হ'তে নানা গিরিপথ হয়ে হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করলে যে দেশে পৌঁছান যায়, সে দেশের প্রাচীন নাম হচ্ছে বাহ্লীক। বাহ্লীক নাম মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। গ্রীকরা এদেশকে বাক্ত্রা (Bactra) নামে অভিহিত করেছে। এ দেশ প্রাচীনকালে একটি সমৃদ্ধশালী রাজত্বে পরিণত হয়েছিল। আলেকজাণ্ডারের বিজয়ের পর এ দেশ কিছুকাল গ্রীকদের হস্তগত থাকে ও খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে কুশাণদের অধীনতা স্বীকার করে। এ দেশের অধিবাসীরা মূলতঃ ইরাণী হলেও গ্রীক ও কুশাণদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল। এই কারণে এ জাতির মধ্যে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, সে সভ্যতায় তিনটি বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। কুশাণরা যখন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করল তখন এ সভ্যতা ভারতের প্রভাব সম্পূর্ণ ভাবে অঙ্গীকার করে নিল ও নূতন রূপ গ্রহণ করল এবং অল্পকালের মধ্যেই বাহ্লীক বৌদ্ধসভ্যতার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হল। মধ্য-এশিয়া ও চীনদেশ বৌদ্ধধর্ম্মে প্রথম দীক্ষালাভ করল এই দেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হাতে।

এ দেশের প্রাচীন কোন নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনও

মাটি খুঁড়ে বের করা হয় নি ; সেই জন্য প্রাচীন যুগের শিল্পের কোন নিদর্শন আমরা এখনও পাই না। তবে বামিয়েন, কপিশা, গান্ধার প্রভৃতি দেশে প্রাচীন শিল্পের যে নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে মনে হয় যে, এ দেশের প্রাচীন শিল্পও একই পন্থা অনুসরণ করেছিল। অর্থাৎ সে শিল্পের মধ্যে গ্রীক, ইরাণীয়, কুশাণ প্রভৃতি জাতির প্রভাব থাকলেও সে শিল্প অনুপ্রেরণা পেয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে। খোটান, কাশ-গর প্রভৃতি স্থানেও যে ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার পরিচয় পাওয়া যায়, তার ধারা খুব সম্ভব বাহ্লীক হতেই গিয়েছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে হিউয়ান্-সাং এদেশের যে বর্ণনা করেছেন, তা থেকে এদেশ কি পরিমাণে ভারতীয় সভ্যতা গ্রহণ করেছিল তা বোঝা যাবে। সে সময়ে এ দেশের রাজ-ধানীর নাম ছিল 'রাজগৃহপুর'। রাজধানীতে শতাধিক বৌদ্ধবিহার। ভিক্ষুদের সংখ্যা তিন সহস্রের উপর এবং তারা সকলেই 'সর্ব্বাস্তিবাদ' সম্প্রদায় অনুসরণ করত।

রাজধানীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে একটি বিরাট বৌদ্ধবিহার অবস্থিত ছিল, তার নাম 'নবসংঘারাম'। হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরে (অর্থাৎ ভারতবর্ষের বাইরে) এ বিহার ছিল একমাত্র বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠান যেখানে গুরু-পরম্পরায় বৌদ্ধশাস্ত্রের মৌলিক আলোচনা চলত। এই সংঘারামের উত্তরে ২০০ শত ফুট

উঁচু বৌদ্ধস্তূপ অবস্থিত ছিল, আর বিহারে যে-সব বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল, যদি হিউয়ান-সাংএর কথা বিশ্বাস করতে হয়, তা হলে মানতে হবে যে, ভারতবর্ষের বাইরে অন্যত্র তার তুলনা ছিল না।

খৃষ্টীয় তৃতীয় চতুর্থ শতকে বহু চীনা ভিক্ষু ভারতবর্ষে না এসে বাহ্লীকদেশের নবসংঘারামে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন—কারণ সেখানেই অনেক উপযুক্ত ভারতীয় পণ্ডিত ছিলেন। নবসংঘারামের এ প্রভাব বহুদিন পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগে আরব সৈন্য নবসংঘারাম আক্রমণ করে। তাদের হাতে যখন এই বিহার বিনষ্ট হয়, তখন বৌদ্ধাধিপত্য প্রবল; বিহার তখন বিপুল আকার ধারণ করেছে। সমস্ত বিহারে তখন তিন শত প্রকোষ্ঠ, বিহারের ভূসম্পত্তি প্রায় ৮০০ বর্গমাইল বিস্তৃত। কিন্তু, এই বিপুল প্রভাবসত্বেও নবসংঘারাম সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়, এবং সেই বিহারের প্রধান পুরোহিতেরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। আরব ঐতিহাসিকগণ এই পুরোহিত-দের 'বরমক' (সংস্কৃত-পরমক) নামে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করবার পর বাগ্দাদ যান এবং তাঁদের বংশধরেরা হারুণ-অল্-রসিদের সময় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। নবসংঘারামের এই মুসলমান-ধর্ম্মে নূতন দীক্ষিত পুরোহিতেরা বাগ্দাদেও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁদের প্রভাবে কালিফ

ভারতীয় গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ ও দর্শনশাস্ত্রে আকৃষ্ট হন ও লোক প্রেরণ করে সিন্ধুদেশ হ'তে ঐ সব শাস্ত্রের পুঁথি সংগ্রহ করান। এই সব গ্রন্থ শীঘ্রই আরবী ভাষায় অনূদিত হয় এবং সে দেশের পণ্ডিতদিগকে নূতন আলোচনায় উদ্বুদ্ধ করে।

বাহ্লীক হ'তে বক্ষু (Oxus) নদী অতিক্রম করে উত্তর-মুখী পথে যে সব দেশে পৌঁছান যেত, সে সব দেশের সঙ্গে এ-যুগে ভারতীয়দের কতটা পরিচয় ছিল তা বলা যায় না। রামায়ণ, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বক্ষু নদীর উল্লেখ পাই। সে নদীর উত্তরে যে-সব দেশ ছিল তার কোন উল্লেখ না পেলেও বক্ষু নদীর উৎপত্তি-স্থলে যে দেশ অবস্থিত ছিল, সে-দেশ যে ভারতীয় সভ্যতা গ্রহণ করেছিল, তার প্রমাণ আছে। এ-দেশ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়েছিল—সে রাজ্যের নাম—তুখার; ভারতীয় সাহিত্যে সে দেশ 'তুষার' নামে উল্লিখিত হয়েছে। এর কারণ এ নয় যে, এ দেশ পার্ব্বত্যদেশ এবং এখানে বহু তুষারপাত হত। উত্তর-ভারতে 'ষ'-এর উচ্চারণ 'খ' ছিল বলেই তুখার ও তুষার যথেচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে। তুখার জাতির সম্পূর্ণ পরিচয় আমরা পাই না, তবে সে জাতি যে প্রাচীন কুশাণদের জ্ঞাতি, তাতে সন্দেহ নেই। তুখার জাতির যখন প্রথম উল্লেখ পাই, তখনই দেখি যে, তারা বৌদ্ধধর্ম্ম

গ্রহণ করেছে। তাদের ভাষায় যে বৌদ্ধশাস্ত্র অনূদিত হয়েছিল, তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে, যদিও সে শাস্ত্রের কোন নিদর্শন স্পষ্টভাবে আমাদের নিকট পৌঁছে নাই। পরবর্ত্তী কালে তুর্কী ভাষায় যে বৌদ্ধ গ্রন্থ পাই সে সব গ্রন্থের অন্তবাক্য হ'তে বুঝতে পারি যে সেগুলি তোগরি (=তুখর) ভাষা হ'তে অনুদিত হয়েছিল যদিচ সে সব তুখার গ্রন্থের নমুনা এখনো পাওয়া যায় নি। তুখার দেশের ভিক্ষুরা চীনদেশে গিয়ে বৌদ্ধশাস্ত্র চীনাভাষায় অনুবাদ করেছিলেন এবং পরবর্ত্তী কালে খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে তাঁরা যে তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধশাস্ত্র সেই দেশের ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন, তার অন্তত একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। 'সুকান্ত' নামক এক তুখার পণ্ডিত 'চক্রসম্বর' নামক একখানি বৌদ্ধতন্ত্রগ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদে সহায়তা করেছিলেন, তার স্পষ্ট উল্লেখ তিব্বতী সাহিত্যে পাওয়া যায়।

বক্ষু নদীর উত্তরে যে দেশ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল, সে দেশ হচ্ছে সুগদ (Sughd—Sogdiana)। এ দেশ চীনা, তিব্বতী ও ভারতীয় সাহিত্যে 'শূলিক' নামে উল্লিখিত হয়েছে। শূলিক আখ্যা পাবার কারণ যে, এ জাতির প্রাচীন ইরাণীয় আখ্যা হচ্ছে 'সুদিক'; আর সেই শব্দই পরিবর্ত্তিত হ'য়ে 'শূলিক' রূপ গ্রহণ করেছিল। শূলিক-জাতি ইরাণীয় জাতির শাখাবিশেষ,

ও তাদের ভাষাও ইরাণীয়। তাদের দেশ অবস্থিত ছিল সেই অঞ্চলে, পরবর্ত্তী সময়ে যার আখ্যা দেওয়া হয় সমরকন্দ। এ জাতি বণিকের জাতি ; এবং বাণিজ্য-ব্যপদেশে মধ্য-এশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের নানাস্থানে খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে বহু উপনিবেশ বিস্তার করেছিল ; খুব সম্ভব এই সময়েই তাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়, কারণ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্য ভাগেই আমরা শূলিক দেশের ভিক্ষুদের চীনদেশে দেখতে পাই। খৃষ্টীয়-তৃতীয় চতুর্থ শতক পর্য্যন্ত যে সব বৈদেশিক ভিক্ষু চীনাভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদে সহায়তা করেছিলেন তার মধ্যে শূলিক ভিক্ষুদের নাম বিরল নয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করবার পূর্ব্বে শূলিকদের কোন সাহিত্য ছিল কি না জানা যায় না। প্রাচীন ইরাণীয় ধর্ম্মশাস্ত্রই তারা গ্রহণ করেছিল ; তাদের স্বকীয় সাহিত্য কিছু গড়ে ওঠে নি। বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হ'বার পর তারা বৌদ্ধসাহিত্য নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করে। এই অনূদিত সাহিত্যের পুঁথি মধ্য-এশিয়ার নানাস্থানে ও বিশেষত তুন্-হোয়াংএর গিরিগুহায় সংগৃহীত হয়েছে। এই সব অনুবাদই হচ্ছে শূলিকদের প্রথম সাহিত্য, এবং এ অনুবাদ না থাকলে শূলিকদের ভাষারও কোনদিন উদ্ধার সাধন করা সম্ভব হ'ত না। এ সাহিত্যের যে সব নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে 'নীলকণ্ঠধারণী',

'দীর্ঘনখসূত্র' ও 'বেস্সান্তর-জাতকে'র শূলিক অনুবাদ উল্লেখ-যোগ্য।

পূর্ব্বেই বলেছি যে শূলিকেরা ছিল বণিকের জাতি, তাদের নানা দেশের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। সেই কারণে তারা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকার্য্যে সহায়তা করতে পেরেছিল। চীনা ভাষায় অনূদিত বৌদ্ধসাহিত্যের মধ্যে একখানি প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রন্থ আছে, সে গ্রন্থ ভারতীয় মূল অনুসরণ করলেও অনূদিত হয়েছিল শূলিক ভাষায় রূপান্তরিত ভারতীয়-গ্রন্থ হ'তে। সেই জন্য তার মধ্যে যে সব পারিভাষিক শব্দ পাই, তা শূলিক ভাষার অন্তর্গত কারণ সপ্তাহের দিন-গুলির নাম—রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনির পরিবর্ত্তে চীনা অনুবাদে যথাক্রমে মিহ্র, মাহ্, বাহ্রাম তীর্, নাহিদ্, ওরমজ্দ ও কেবন্ পাই। এ শব্দগুলি পারসিক হতে গৃহীত হয়েছিল কিন্তু যারা গ্রহণ করেছিল, তারা হচ্ছে শূলিক।

শূলিকদেশের (=সমরকন্দ) উত্তরে যে সব জাতি বাস করত, তাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম বা ভারতীয় সভ্যতা কতটা প্রসার লাভ করেছিল, তা বলা যায় না। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে এ সব দেশ তুর্কী জাতির হস্তগত হয়। তুর্কীরা কিছুকালের জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল সত্য, কিন্তু তাদের উপর সে

প্রভাব ছিল ক্ষণস্থায়ী। সপ্তম শতকে যখন হিউয়ান্‌-সাং এ পথে আসেন, তখন তুর্কীরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য। প্রতীচ্য-তুর্কীদের রাজধানী তাস্কেন্দের উত্তরে থিয়েন-শান্‌ পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। হিউয়ান্‌-সাংএর কথা বিশ্বাস করলে মানতে হবে যে, তুর্কীরা তখন ছিল অগ্নি-উপাসক এবং তুর্কীদের অধিপতি বা খানখানানের (=ইয়াব্‌গু-কাগান্‌) বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতীয় সভ্যতাকে মোটেই ভাল চোখে দেখতেন না।

কিন্তু হিউয়ান-সাং এ দেশ ত্যাগ করবার অল্পকাল পরেই খান্‌-খানান্‌ নালন্দার বিখ্যাত পণ্ডিত প্রভাকরমিত্র কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই যুগে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব পণ্ডিত ছিলেন, প্রভাকরমিত্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বিদেশযাত্রা মনস্থ করে দশ জন শিষ্য সঙ্গে করে তিব্বত অভিমুখে রওনা হন। তিব্বত ও নানাদেশ অতিক্রম করে অবশেষে তিনি প্রতীচ্য-তুর্কীদের রাজধানীতে উপনীত হলেন। তুর্কীদের অধিপতি তাঁকে ও তাঁর শিষ্যবর্গকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করলেন ও আশ্রয় দিলেন। প্রভাকর-মিত্রের সঙ্গে বাক্যালাপে খান্‌-খানান্‌ ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্মে আকৃষ্ট হলেন ও সে ধর্ম্ম গ্রহণ করলেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই তুর্কী-ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদ আরম্ভ হয়। প্রভাকরমিত্র

তুর্কীদের রাজধানীতে দীর্ঘকাল থাকতে পারেন নি, কেন-না তাঁর প্রতিভার কথা বহুদূরে ছড়িয়ে পড়েছিল ও সেই কারণে চীনদেশের রাজদূত প্রভাকরমিত্রকে চীনদেশে পাঠাবার জন্য খান্-খানানকে অনুরোধ করলেন, প্রভাকরমিত্র ৬২৬ খৃষ্টাব্দে চীনদেশের রাজধানীতে পৌঁছুলেন। তাঁর শেষজীবন চীন-দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ও সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থের চীনা ভাষায় অনুবাদকার্য্যেই অতিবাহিত হয়। প্রভাকরমিত্রের পর, তুখার ও মধ্য-এশিয়ার অন্যান্য জাতির সংস্পর্শে তুর্কীজাতির বিভিন্ন শাখা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু মধ্য-এশিয়ায় আরবদের প্রসারলাভের পর সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে তাদের মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করতে বেশি সময় লাগে নি, তার কারণ তুর্কীরা তখন ছিল বহু পরিমাণে যাযাবর। স্থায়ীভাবে কোন ধর্ম্ম বা সভ্যতা গ্রহণ করা তখন তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাদের সে মনোভাব বহুকাল পরেও যে পরিবর্ত্তিত হয় নি, তার প্রমাণ অল্প দিন পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়েছে।

বাহ্লীক দেশ হতে পশ্চিম দিকে যে পথ কাশগর অভি-মুখে গিয়েছে, সে পথের উপর যে-সব দেশ অবস্থিত, ভারত-বর্ষের সঙ্গে সে সব দেশেরও যোগাযোগ ছিল। এ সব দেশের মধ্যে বোক্কন (Wakhan), শ্যামক (Shignan) ও রমঠ প্রভৃতি দেশ ভারতীয় সাহিত্যে উল্লিখিত হয়েছে। এ সব



কাশগরের নিকটবর্ত্তী পথে অধ্যাপক পল পেলিও : একধারে পাহাড়শ্রেণী, অন্যদিকে মরুভূমি
(পৃঃ ৩৪)



'তুন-হোয়াং'-এর গুহামন্দিরের সম্মুখভাগ (পৃঃ ৮৫)



গণেশ মূর্ত্তি ঃ খোটানের নিকটবর্ত্তী নিয়া নামক স্থানে প্রাপ্ত (পৃঃ ৫৫)



দেশ পামিরের নানা উপত্যকায় অবস্থিত, আর সে সব উপত্যকায় কাশ্মীর হয়ে গিলগিটের পথেও পৌছান যেত। এই সব উপত্যকায় কোন কালেই কোন স্থায়ী সভ্যতা গড়ে ওঠে নি। এ সব দেশের জমি ও আবহাওয়া কোন দিনই যে মানুষকে স্থায়ীভাবে আকৃষ্ট করতে পারে নি, তার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বেই পেয়েছি। সেই জন্য এ অঞ্চলে প্রাচীন যুগের এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি, যা থেকে প্রাচীন সভ্যতার ধারা স্পষ্টভাবে ধরা যেতে পারে।

হিউয়ান্-সাংএর বর্ণনা থেকে বুঝতে পারি যে, শ্যামক ও কাশগরের মাঝামাঝি পামিরের অন্তঃপাতী নানা জনপদে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল। খো-ফান্-তো (=খাবান্দ ?) নামক জনপদের রাজা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকল্পে বহু চেষ্টা করেছিলেন। বৌদ্ধ কিম্বদন্তী সত্য হলে বলতে হবে, বহুপূর্ব্বেই এ দেশ বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল এবং মৌর্য্যবংশীয় অশোক এ দেশে যে শুধু রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন তা নয়, বৌদ্ধধর্ম্মের জয়-ঘোষণা করবার জন্য নানা স্তূপও স্থাপন করেছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে এ দেশের রাজা বৌদ্ধশাস্ত্রকার আর্য্য কুমারলাতের জন্য একটী বিহার নির্ম্মাণ করান। কুমারলাত ছিলেন সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের আচার্য্য, খুব সম্ভব খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের লোক, তাঁর জন্মস্থান তক্ষশীলা। তিনি অল্প

বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্রকার নামে অল্প দিনের মধ্যে তাঁর যশ বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করতে চান নি বলে বন্দী হিসাবে তাঁকে এ দেশে নিয়ে আসা হয়। তাঁর পরবর্ত্তী জীবন এই দেশে শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্ররচনায় অতিবাহিত হয়। কুমারলাত যে স্থানে বাস করেন, পরবর্ত্তী রাজারা তাকে বিরাট বৌদ্ধবিহারে পরিণত করেছিলেন। হিউয়ান্‌-সাং নিজে এ বিহারের বর্ণনা করেছেন।

এ পর্য্যন্ত যে সব দেশের কথা উঠেছে, সেগুলি মধ্য-এশিয়ার প্রান্তভূমির অন্তর্গত। সে সব দেশের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা না করলে এবং সে সব দেশের প্রাচীন সভ্যতার রূপ স্পষ্টভাবে না ধরতে পারলে মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগসূত্রের খোঁজ সহজে পাওয়া যায় না। সেই জন্য এ আলোচনা প্রয়োজনীয়।

কাশগর ও খোটান

কাশগর

পামির অতিক্রম করলেই মধ্য-এশিয়ার আরম্ভ। মধ্য-এশিয়ার এই অংশেই প্রাচীনকালে বহু স্বাধীন রাজ্য অবস্থিত ছিল, আর সে সব রাজ্যের মধ্যে কাশগর ছিল অন্যতম। পূর্ব্বেই বলেছি যে মধ্য-এশিয়ার দু'টী প্রধান পথ এবং ভারতবর্ষ ও পামিরের অন্তঃপাতী নানা রাজ্য হ'তে নানা পথ এসে কাশগরে মিলিত হয়েছে। এই কারণেই কাশগর বাণিজ্যের একটি কেন্দ্রস্থানে পরিণত হয়েছিল।

কাশগর হচ্ছে আধুনিক নাম, হিউয়ান্-সাং এদেশের যে নাম উল্লেখ করেছেন, সে নাম হচ্ছে কিয়ে-শা (=কাশ ?)। সম্ভবতঃ এ নাম 'খশ' শব্দ হতে উদ্ভূত হয়েছিল, কারণ একটী বিশিষ্ট জাতির নাম হিসাবে আমরা সে শব্দের উল্লেখ পাই। বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতায় নানা দেশ ও নানা জাতির উল্লেখ আছে এবং সেই সঙ্গে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 'খশ' জাতির অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। হয়ত এই কাশগরই ছিল প্রাচীনকালে 'খশ' জাতির বাসভূমি। পুরাণেও 'খশ' জাতি 'দরদ'দের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে, এবং দরদ জাতির

বাসভূমি হচ্ছে কাশ্মীরের উত্তরে, যাকে এখন বলা হয় দার্দিস্তান।

হিউয়ান্‌-সাং কাশগরকে 'খশ' নামে অভিহিত করলেও হিউয়ান্‌-সাংএর পূর্ব্ববর্ত্তী চীনা সাহিত্যে সর্ব্বত্র এদেশের প্রচলিত নাম হচ্ছে 'শু-লে' বা 'শু-লেই'। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের একখানি সংস্কৃত-চীনা অভিধানে এ নামের প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে 'শূলি' এবং 'শূলি' জাতিকে বর্ব্বর বলা হয়েছে। তারা বর্ব্বর ছিল কি না, তা' আমরা ঠিক জানি না, অপর পক্ষে তারা যে একটী সুসভ্য জাতির শাখা-বিশেষ তাতে সন্দেহ নেই। 'শুলে' নাম চীনা সাহিত্যে কোন কোন স্থানে 'শা-লে' রূপেও পাওয়া যায় এবং তার আনুমানিক সংস্কৃত প্রতিশব্দ হচ্ছে 'শৈল'।

সুতরাং মনে হয় যে, প্রাচীনকালে এ দেশকে শূলি, মতান্তরে শৈলদেশ, হিউয়ান্‌-সাংএর সময়ে 'খশ'-দেশ ও পরবর্ত্তীকালে খশগর (= কাশগর) বলা হ'ত। খশ জাতি ছিল শক জাতির শাখা; তাদের কথ্য ভাষা ছিল প্রাচ্য ইরাণীয়, যার নমুনা খোটান অঞ্চলেও পাওয়া যায়। হিউয়ান্‌-সাং বলেছেন যে, এ জাতির মাথা চাপা ও চোখ নীল, আর এ বর্ণনা সত্য হলে তা শক জাতির আনুমানিক চেহারার সঙ্গে মেলে। চীনা বর্ণনায় দেখতে পাই যে, এ দেশ ছিল বালুকা-

স্তূপে পূর্ণ, এ দেশের জমি ছিল অনুর্ব্বর, কিন্তু তবুও এ দেশ ছিল নানা ফল-ফুলের দেশ। এ দেশে নানারকমের ফলের চাষ হ'ত এবং এদেশ হতে ভাল পশমের কম্বল ও অন্যান্য জিনিষ বাইরে রপ্তানী হ'ত। সে-কথা যে সত্য তা'তে সন্দেহ নাই, কারণ ভারতীয় বণিকেরা এখনও সে দেশ হ'তে পশমের নানা জিনিষ ভারতবর্ষে নিয়ে আসে।

কাশগরের অধিবাসীরা কবে ভারতীয় সভ্যতা গ্রহণ করেছিল, তা আমরা সঠিক জানি না, তার কারণ কাশগরের অন্তঃপাতী স্থানে মাটি খুঁড়ে প্রাচীন সভ্যতার এমন কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় নি, যা থেকে কালনির্দ্দেশ করা যেতে পারে। তবে কাশগর খোটানের পথে অবস্থিত, আর খোটান খুব সম্ভব খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকেই ভারতীয় সভ্যতার ধারা পেয়েছিল। কাশগরের সঙ্গেও হয়-ত ভারতের যোগসূত্র ঐ যুগেই স্থাপিত হয় এবং সেই যোগসূত্রের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে শক জাতির নানা শাখা কুশাণদের পূর্ব্বেই ভারতে প্রবেশ করে ও নানাস্থানে রাজ্য বিস্তার করে।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে এ দেশের যে বিবরণ পাই, তা থেকে বোঝা যায় যে, এ দেশে তখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল। সকলেই 'সর্ব্বাস্তিবাদ' সম্প্রদায়ের বৌদ্ধধর্ম্ম অনুসরণ করত, আর সে

সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত যে সে-দেশে কাশ্মীর হতে প্রচারিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নাই। হিউয়ান-সাং দুঃখ করেছেন যে, এদেশের বৌদ্ধেরা একান্তভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের নিয়ম-কানুন পালন করে, কিন্তু তাদের সত্যকার কোন জ্ঞান নাই, তার কারণ তারা মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের কোন খোঁজই রাখে না। এ কথা এখানে বলে রাখা উচিত যে, হিউয়ান-সাং ছিলেন মহাযানের ভক্ত এবং বৌদ্ধধর্ম্মের জ্ঞান-কাণ্ড তাঁর সময়ে মহাযানেই পর্য্যবসিত হয়েছিল।

কাশগরে যে লিপি প্রচলিত ছিল, তা ভারতীয় লিপি, খুব সম্ভব সে লিপি ব্রাহ্মী-লিপি নয়, খরোষ্টী। কাশগরের প্রাচীন লিপি ও সাহিত্যের কোন নমুনা পাওয়া যায় নি, সুতরাং এ কথা অনুমান মাত্র। হয় ত এ অনুমান সত্য, কারণ খরোষ্টী লিপি যে দেশে প্রচলিত ছিল, সে দেশ পাঞ্জাব হতে খোটান পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অবশ্য এ সব দেশে ব্রাহ্মী লিপিরও নমুনা পাওয়া যায়, তবে খরোষ্টীর প্রচলন যে বেশী ছিল, তাতে সন্দেহ নাই। সেই কারণে পরবর্ত্তী কালের দু'একখানি চীনা গ্রন্থে কাশগরকে খা-লু-শা(ন্)-তা-লো বা খরোষ্ট্র দেশ বলা হয়েছে এবং খরোষ্টী লিপি যিনি সৃষ্টি করেছিলেন, সেই খরোষ্ট্র ঋষিও কাশগর এবং খোটান অঞ্চলে রচিত প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছেন।

কাশগর অঞ্চলে যে স্থানীয় ভাষা চলিত ছিল, খুব সম্ভবতঃ সে ভাষা ছিল প্রাচ্য-ইরাণীয়, কারণ সে দেশের অধিবাসী ছিল ইরাণীয় জাতির শাখাবিশেষ। এই প্রাচ্য ইরাণীয় ভাষায় লিখিত প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রের পুঁথি খোটান ও কাশগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে পাওয়া গিয়েছে। সে শাস্ত্র এবং প্রাচ্য ইরাণীয় ভাষার উপর সংস্কৃত প্রভাবের কথা আমরা পরে আলোচনা করব।

কাশগর ও খোটান অঞ্চলে এই ইরাণীয় কথ্য ভাষা ছাড়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রাকৃত ভাষাও চলিত ছিল। চীনা ইতিহাসে তার নিঁখুত প্রমাণ রয়েছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে চীনা পরিব্রাজকেরা এদেশের ভাষার বিভিন্নতা উল্লেখ করে বলেছেন, সংস্কৃত 'উপাধ্যায়' শব্দ কাশগরে—'উ-শে' (=ওঝা) এবং খোটানে হো-শাং (=উজ্ঝাঁও) রূপ ধারণ করেছে। 'ওঝা' ও 'উজ্ঝাঁও' এই দুই শব্দই যে প্রাকৃত তাতে সন্দেহ নাই। কাশগরে ভারতীয় উপনিবেশ ছিল, আর সেই উপনিবেশের অধিবাসীদের মধ্যেই এই প্রাকৃত ভাষা কথ্য ভাষা হিসাবে চলিত ছিল।

কাশগর হতে দক্ষিণপূর্ব্বে কুন্-লুন্ পর্ব্বতের শাখা-পর্ব্বতমালা অবস্থিত। এ পর্ব্বতমালার পাদদেশ দিয়ে প্রশস্ত পথ খোটান অভিমুখে গিয়েছে, এই পথের উপর ইয়ারকন্দ

অবস্থিত। ইয়ারকন্দে পৌছিবার পূর্ব্বে যে নদী অতিক্রম করতে হয়, তার বর্ত্তমান নাম কিজিল-দরিয়া এবং প্রাচীন নাম ছিল সীতা এবং সেই নামেই হিউয়ান-সাং এ নদীর উল্লেখ করেছেন। পূর্ব্বে বলেছি সীতা নদীর নাম ভারতীয় সাহিত্যে পাই, আর এ নদী হচ্ছে বর্ত্তমান 'তারিম'। কিজিল-দরিয়া তারিমে মিলিত হয়েছে এবং তার সমস্ত জল সেই নদীকেই সরবরাহ করছে। সুতরাং প্রাচীনকালে কিজিল-দরিয়া ও তারিম উভয়কে অভিন্ন মনে করা হ'ত এবং সেই জন্য উভয়েই সীতা নামে খ্যাত ছিল।

চোক্কুক (ইয়ারকন্দ)

ইয়ারকন্দ প্রাচীনকালে একটি ক্ষুদ্র বর্দ্ধিষ্ণু রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। সে রাজ্য চীনা ইতিহাসে কখনো সো-কিউ এবং কখনো চো-কিউ-ক নামে উল্লিখিত হয়েছে। এ উভয় শব্দই হচ্ছে প্রাচীন চীনা রূপান্তর—আসল নাম ছিল চোক্কুক। প্রাচীন চোক্কুক শহর যে স্থানে অবস্থিত ছিল, তার বর্ত্তমান নাম হচ্ছে কারগালিক্ (Karghalik)। এ দেশ কাশগর হতে বেশী সমৃদ্ধশালী, তার কারণ এ দেশের মধ্য দিয়ে দু'টি নদী প্রবাহিত—একটি হচ্ছে কিজিল-দরিয়া অন্যটী ইয়ারকন্দ-দরিয়া। তা ছাড়া মরুভূমি হতে এদেশ অনুচ্চ পর্ব্বতমালার

দ্বারা সুরক্ষিত। সেই জন্য এ দেশ বহুপ্রকারের ফল-ফুলে সুশোভিত ছিল এবং অধিবাসীরা বাণিজ্য হতে কৃষিকার্য্যই তাদের পক্ষে বেশী উপযোগী মনে করত।

এ দেশে প্রাচীন কালে যে লিপি প্রচলিত ছিল, তা' খোটানের লিপির অনুরূপ—অর্থাৎ ভারতীয় লিপি। অধিবাসীরা ছিল বৌদ্ধ এবং যে বৌদ্ধধর্ম্ম তারা অনুসরণ করত তা' হচ্ছে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম। এদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম প্রচারিত হয় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে। কুচী রাজ্যের বিখ্যাত বৌদ্ধভিক্ষু কুমারজীব এই সময়ে ভারতবর্ষ হতে মহাযান-শাস্ত্র মধ্য-এশিয়ায় নিয়ে যান এবং মধ্য-এশিয়ায় মহাযান-মন্ত্র প্রচার করতে সুরু করেন। সে সংবাদ পেয়ে চোক্কুক রাজ্যের দুই রাজকুমার সূর্য্যসোম ও সূর্য্যভদ্র কুমারজীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও মহাযানে দীক্ষিত হন। কুমারজীব তাঁদের শুধু যে দীক্ষাই দিলেন তা নয়, মহাযানের যে সব প্রধান শাস্ত্র—আর্য্যদেবের 'শত-শাস্ত্র', নাগার্জ্জুনের 'মাধ্যমক-শাস্ত্র' ও অন্যান্য গ্রন্থেও তাঁদের শিক্ষা দিলেন। রাজকুমারদ্বয় এ সব শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে দেশে ফিরলেন ও মহাযান-ধর্ম্ম প্রচার করলেন।

হিউয়ান-সাংএর সাক্ষ্য গ্রহণ করলে মানতে হবে যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে এদেশ ছিল মহাযানের একটী বড় কেন্দ্র।

এ দেশের নানা বৌদ্ধবিহারে বহু মহাযান-শাস্ত্রের পুঁথি পাওয়া যেত, মহাযান-সূত্র পিটকের পুঁথিও দুষ্প্রাপ্য ছিল না এবং হয়ত মধ্য-এশিয়ায় এ দেশ ছিল একমাত্র দেশ, যেখানে লক্ষ-শ্লোকে লিখিত মহাযান গ্রন্থের অন্ততঃ দশখানি পুঁথি পাওয়া যেত। লক্ষ শ্লোকে লিখিত মহাযান গ্রন্থ খুব বেশী ছিল না—'শতসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা' ও 'অবতংসক' ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থের নাম আমরা জানি না। অপেক্ষাকৃত ছোট গ্রন্থের প্রচলন এ দেশে খুব বেশী ছিল।

হিউয়ান-সাং স্বদেশে ফিরবার পথে যখন এদেশে আসেন, তখনও এ দেশে শতাধিক বৌদ্ধ বিহার বর্ত্তমান ছিল এবং বৌদ্ধভিক্ষুদের সংখ্যা ছিল সহস্রাধিক। খুব সম্ভবতঃ তখন বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির যুগ আরম্ভ হয়েছে, কারণ হিউয়ান-সাং-এর বর্ণনা হ'তে বুঝতে পারি যে, বহু বৌদ্ধ-বিহার তখন ধ্বংসোন্মুখ। বৌদ্ধধর্ম্মে তখন তান্ত্রিক প্রভাব দেখা দিয়েছে এবং হয়ত সেই কারণে এ দেশের বৌদ্ধদের মনে তখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, সাধকেরা শূন্যমার্গে বিচরণ করতে পারেন। হিউয়ান-সাং নিজেও অলৌকিকে কম বিশ্বাসী ছিলেন না এবং সেইজন্য তিনি ইয়ারকন্দের অধিবাসীদের মুখে সাধকদের সম্বন্ধে যে সব কিম্বদন্তী শুনেছিলেন, তা' অতি আগ্রহের সঙ্গে লিপি-বদ্ধ করেছেন। ইয়ারকন্দের দক্ষিণে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, আর

সে পর্ব্বত ঘন বনানীর দ্বারা আবৃত। এই পর্ব্বতমালা হতে নানা স্রোতস্বতী জল বহন করে আনে। হিউয়ান্-সাং বলেছেন যে, সেই সব পর্ব্বতের ধারে বনানীর অন্তরালে কিংবা স্রোতস্বতীর নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক গুহা আছে, আর সেই সব গুহা হচ্ছে বৌদ্ধ সাধকদের নির্জ্জনে সাধনার স্থান। ভারতবর্ষ হ'তে প্রায়ই সাধকেরা শূন্যমার্গে এসে এই সব নিভৃত গুহায় সাধনায় রত থাকতেন, আর তাঁদের অনেকে এইখানে নির্ব্বাণ লাভও করেছিলেন। এ কথা সত্য যে, মধ্য-এশিয়ার নানাস্থানে এই জাতীয় বহু গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে, হয়ত বা এখনও এমন অনেক গুহা আছে যা' লোকের চোখে পড়ে নি। এ কথাও সত্য যে, এই সব গুহা ছিল বৌদ্ধসাধকদের নিভৃতে সাধনার স্থান। মধ্য-এশিয়ার নানা স্থানে প্রাচীন যুগের যে সব নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে চৌরাশী সিদ্ধের চিত্রাবলীও দুর্ল্ভ নয়। চৌরাশী সিদ্ধেরাই ভারতে ও ভারতের বাইরে নেপালে ও তিব্বতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন এবং তাঁদের সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কিম্বদন্তী বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রচলিত হয়েছে। অলৌকিকে এ বিশ্বাস মহাযান বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাবেই প্রচারিত হয় এবং খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে ইয়ারকন্দের মহাযান-পন্থীদের মনে সে বিশ্বাসের উদয় হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

খোটান

মধ্য-এশিয়ার দক্ষিণবাহী পথের উপর যে সব দেশ অবস্থিত, তন্মধ্যে খোটান ছিল, সেকালে সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল সমৃদ্ধিশালী ও রাজনৈতিক হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী। মধ্য-এশিয়ার দক্ষিণ ভাগে এ দেশ ছিল সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র এবং খোটানের নিকটবর্ত্তী সমস্ত দেশই কাশগর, ইয়ারকন্দ, নিয়া ইত্যাদি খোটান হ'তে নানাযুগে সভ্যতার ধারা পেয়েছিল।

খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতক হ'তে চীনা-সাহিত্যে খোটানের উল্লেখ পাই, তারপর প্রতি যুগেই সে সাহিত্যে ধারাবাহিক ভাবে খোটানের কথা রয়েছে। চীনা সাহিত্যে এ দেশের নাম 'ইউ-থিয়েন' রূপ গ্রহণ করেছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের দিকে এ দু'টি কথার প্রকৃত উচ্চারণ ছিল গো-দান (গোদান)। ঐ সময়ের বৌদ্ধসাহিত্যে চারটী মহাদেশের মধ্যে 'গোদান' অন্যতম এবং অনুমান হয়, এ দেশ হচ্ছে সেই দেশ, পরবর্ত্তী কালে যাকে বলা হয়, খোটান। 'গোদান' শব্দ রূপান্তরিত হয়ে খোটান, খোটন, খোটংন প্রভৃতি আকার ধারণ করেছে। হিউয়ান-সাংএর বর্ণনায় এ দেশের নাম পাই কু-স-তান্-ন এবং হিউয়ান-সাং নিজে মনে করেছেন যে, আসল নাম হচ্ছে সংস্কৃত-'কুস্তন' (কু=পৃথিবী)।

হিউয়ান-সাং ছিলেন সংস্কৃতনবীশ এবং সেই কারণে তিনি প্রতি নামের পেছনে সংস্কৃত শব্দের ছায়া খুঁজেছেন এবং যেখানে সে ছায়া খুঁজে পাননি, সে স্থানে নিজের সংশোধিত পাঠ দিয়েছেন। চীনা সাহিত্যে কোথাও খোটানের নাম কু-স-তান্-ন পাওয়া যায় না, বরং কোন কোন গ্রন্থে কু-তান্-ন পাই এবং সে নাম যে 'খোতান' বা 'খোটানে'র সঠিক চীনা রূপান্তর তা'তে সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস, সে নামের সঙ্গে 'স' যোগ করে 'কুস্তন' দাঁড় করবার জন্য হিউয়ান-সাং নিজেই দায়ী।

খোটানে যে জাতি বাস করত, খুব সম্ভব তারা ছিল একটা মিশ্র জাতি। তাদের মধ্যে প্রাচ্য-ইরাণীয়, শক, শূলিক (বা সুগ্দীয়), চীনা, ভারতীয় সকল জাতিরই স্থান ছিল। সেখানে যে ভারতীয়দের খুব প্রাচীন উপনিবেশ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। বৌদ্ধ-সাহিত্যে যে কিম্বদন্তী পাই, তা বিশ্বাস করলে বুঝতে হ'বে এ দেশে, খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকেই ভারতীয়েরা উপনিবেশ বিস্তার করেছেন। অশোকের পুত্র কুণাল ছিলেন তক্ষশীলায় রাজপ্রতিনিধি। এই সময়ে বিমাতার চক্রান্তে তিনি অন্ধ হ'ন এবং তাঁর পার্ষদগণ ও অনুচরেরা এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে কুণালকে নিয়ে স্বদেশে পরিত্যাগ করলেন ও খোটানে উপস্থিত হ'লেন।

খোটানে কুণাল রাজপদে অভিষিক্ত হন। এবং পরবর্ত্তীকালে তাঁর বংশধরেরাই সে দেশে রাজত্ব করেন। এ কিম্বদন্তী আনুবর্ণিক ভাবে সত্য না হলেও এ কথা ঠিক যে খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বেই খোটানে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। খোটানের নিকটবর্ত্তী নানা স্থানে প্রাচীন যুগের যে সব নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা পুঁথি, রাজকীয় ছাড়পত্র প্রভৃতি আছে, আর সে লিপি হচ্ছে খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকের। যে ভাষায় সে সব পুঁথিপত্র লেখা, সে ভাষা হচ্ছে ভারতীয় প্রাকৃত-ভাষা, এবং সে 'প্রাকৃত' উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশ বা গান্ধার অঞ্চলের 'প্রাকৃত'। খোটানে ও তার নিকটবর্ত্তী নানা স্থানে যখন খৃষ্টীয় প্রথম শতকের দিকে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল তখন সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে অন্ততঃ তার একশ' বৎসর পূর্ব্বে গান্ধার বা তক্ষশীলা অঞ্চলের ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা সে ভাষা খোটান প্রদেশে নিয়ে গিয়েছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে খোটানের যে বর্ণনা পাই, তা থেকে বুঝতে পারি যে, সে দেশের অধিবাসীরা ছিল সুসভ্য, তাদের বেশভূষা ও আচার-ব্যবহার সমস্তই ছিল অত্যন্ত মার্জ্জিত এবং তাদের মধ্যে নৃত্যগীতের প্রচলন খুব বেশী ছিল। প্রায় সকলেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল, রাজধানীতে বৌদ্ধ

বিহারের সংখ্যা শতাধিক আর ভিক্ষুদের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারের উপর।

খোটানে কোন্ সময় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তা ঠিক জানা যায় না। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে খোটানের বৌদ্ধভিক্ষুরা বিশ্বাস করত যে, অতি প্রাচীনকালে বোধিসত্ত্ব বৈরোচন কাশ্মীর হতে এসে খোটানে প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। বৈরোচন হচ্ছেন মহাযান সম্প্রদায়ের দেবতা; সুতরাং খোটানের প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম যদি মহাযান হয়, তা-হলে মানতে হবে যে, সে ধর্ম্ম খোটানে খৃঃ-পূর্ব্ব প্রথম শতকের পূর্ব্বে প্রচারিত হয় নি, কারণ সে ধর্ম্ম যে ঐ সময়ের পূর্ব্বে তার বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে নি, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

খোটানের প্রাচীন নিদর্শন যে-সব স্থানে পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি এখন মরুভূমির বালুকাগর্ভে। খোটানের নিকটবর্ত্তী যোৎকান, রাওয়াক্, দান্দান্-উইলিক্ ও নিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন যুগের বহু ধ্বংসস্তূপ পাওয়া গিয়েছে, এবং সে সব স্তূপে সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, প্রাচীন কালে সে স্থানগুলি ছিল খোটানীয় সভ্যতার নানা বর্দ্ধিষ্ণু কেন্দ্র। মরুভূমি প্রসারলাভ করবার জন্য এ স্থানগুলি ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হয়। 'নিয়া' খৃষ্টীয় তৃতীয়

শতকে ও অন্যান্য স্থানগুলি খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের দিকে পরিত্যক্ত হয়েছিল।

খোটানের প্রাচীন রাজধানী যোৎকানে অবস্থিত ছিল; এইস্থানে প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের নানা ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, আর সেই সব ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা, পুঁথিপত্র প্রভৃতির নানা নিদর্শন খোটান-সভ্যতায় ভারতীয় প্রভাবের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে খোটানে যে রাজবংশ রাজত্ব করত, তার নাম হচ্ছে 'বিজয়'। এই বংশের কয়েকটি রাজার নাম চীনা ইতিহাসে ও নিয়ায় প্রাপ্ত খরোষ্ঠী লেখমালায় উল্লিখিত হয়েছে। এই রাজারা প্রাকৃত ভাষায় নিজেদের "মহনুঅব মহরয়" (মহানুভবঃ মহারাজঃ) আখ্যা দিয়েছেন। খোটানের অন্তঃপাতী নানা স্থানে অনেক প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে, যার উপর খরোষ্ঠী লেখা আছে। এই সব মুদ্রা কোন ভারতীয় রাজবংশের রাজারা ব্যবহার করেছিলেন বলেই অনুমান করা হয়।

খোটান ও তার নিকটবর্ত্তী নানাস্থানে খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত যে সব পুঁথিপত্র পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে এক নূতন ধম্মপদের খণ্ডিত পুঁথি প্রসিদ্ধ। এই পুঁথি পণ্ডিতদের হস্তগত হবার পূর্ব্বে পালি ভাষায় লিখিত ধম্মপদের সঙ্গেই

শুধু তাঁদের পরিচয় ছিল। তিব্বতী ভাষায় একখানি সংস্কৃত ধম্মপদের (=উদানবর্গ) অনুবাদ ছিল, কিন্তু তার মূলও মধ্য-এশিয়া হতে পাওয়া গিয়েছে। খোটানের ধম্মপদ প্রাকৃত-ভাষায় লিখিত, আর সে প্রাকৃত ভাষা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাচীন কথ্য ভাষা। সুতরাং এ প্রাকৃত ধম্মপদ ছিল এমন একটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের, যার প্রচলন ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। সে সম্প্রদায় পালিভাষায় বা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধম্মপদ গ্রহণ করে নি। খোটানে প্রাপ্ত এই ধম্মপদ প্রাকৃত-ভাষায় লেখা হলেও অন্যান্য ধম্মপদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। দু' একটি শ্লোক উদ্ধার করলেই তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে—

অপ্রমদু অমতপদু প্রমদু মুচুনো পদ।
অপ্রমত ন মিয়তি যে প্রমত যধ মুতু॥
এত বিশেষধ ঞতু অপ্রমদস পনিতো।
অপ্রমদি প্রমোদিঅ অরিঅন গোঅরি রত॥

পালি—

অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং।
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথা মতা॥
এতং বিসেসতো ঞত্বা অপ্পমাদম্হি পণ্ডিতা।
অপ্পমাদে পমোদন্তি অরিয়ানং গোচরে রতা॥

সংস্কৃত—

অপ্রমাদো হ্যমৃতপদং প্রমাদো মৃত্যুনঃ পদম্।
অপ্রমত্তা ন ম্রিয়ন্তে যে প্রমত্তাঃ সদা মৃতাঃ॥
এতাং বিশেষতো জ্ঞাত্বা হ্যপ্রমাদস্য পণ্ডিতঃ।
অপ্রমাদে প্রমদ্যেত নিত্যমার্য্যঃ স্বগোচরম্॥

প্রাকৃত ধম্মপদের পুঁথি খণ্ডিত, সেই জন্য সে পুঁথিতে অতি অল্পসংখ্যক শ্লোকই পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু, এ পুঁথি হতে আমরা একটি নূতন বৌদ্ধসাহিত্যের খোঁজ পাই, যা প্রাকৃতে রচিত হয়েছিল। এই প্রাকৃত বৌদ্ধসাহিত্যের খোটান অঞ্চলে প্রচলন ছিল।

খোটানের নিকটবর্ত্তী স্থানে খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত অন্যান্য যে সব লেখ পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি বেশীর ভাগ কাষ্ঠফলক —এগুলিকে বলা হয় কীলমুদ্রা আর এ সব কীলমুদ্রা ছিল রাজকীয় অনুজ্ঞা-পত্র। এর ভাষা প্রাকৃত, এবং সে প্রাকৃতও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রাকৃত, তবে তার উপর খোটানের স্থানীয় প্রভাবও যথেষ্ট রয়েছে।

ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত বৌদ্ধসাহিত্যের নানা খণ্ডিত পুঁথিও খোটান অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। পূর্ব্বেই বলেছি, এ ব্রাহ্মী ভারতীয় গুপ্তলিপি হতে উদ্ভূত—তবে সে লিপি খোটানে কতকগুলি স্থানীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল। এই লিপিতে

লিখিত যে সব পুঁথি পাওয়া যায়, তা দু' রকম—(১) বৌদ্ধ-গ্রন্থের খোটানীয় অনুবাদ, (২) সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থের পুঁথি। প্রথম শ্রেণীর পুঁথি হতে বোঝা যায় যে, অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ সংস্কৃত হতে খোটানী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। 'সুবর্ণপ্রভাস-সূত্র' মহাযানের একখানি মৌলিক ও প্রাচীন গ্রন্থ। এ গ্রন্থ যে মধ্য-এশিয়ার নানাস্থানে অধীত হ'ত, তার বহু প্রমাণ আছে। এই সুবর্ণপ্রভাসসূত্রের প্রাচীন খোটানীয় অনুবাদের খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। এই পুঁথির এক লাইন উদ্ধার করলে সে ভাষার নমুনা এবং সে ভাষার উপর সংস্কৃতের প্রভাব কতটা ছিল, তার প্রমাণও পাওয়া যাবে—

সদ্ধম ত্তী বা রুচিরকেত্তি বৌধিসত্ব ত্তিন সুহিন সীরবেত্ত্সে উংস্যো। হ্বংঞ য্সংর্বৈ কূসি ত্তে।—

=সিদ্ধম্ অথ খলু রুচিরকেতুর্নাম বোধিসত্ত্বঃ তেন সুখেন আনন্দেন (?) সুপ্তঃ। স্বপ্নান্তরগতঃ সুবর্ণাং সুবর্ণময়িকাং—

এই খোটানীয় ভাষা প্রাচীন ইরাণীয় ভাষার শাখাবিশেষ, তা'কে বলা হয় প্রাচ্য ইরাণীয়। খোটানের প্রাচীন ভাষার বৌদ্ধগ্রন্থের যে সব অনুবাদ পাওয়া গিয়েছে, সেই গুলিই হ'ল প্রাচ্য ইরাণীয় ভাষার একমাত্র নিদর্শন। সুতরাং এ নিদর্শন না থাকলে সে ভাষা কখনো উদ্ধার করা সম্ভব হ'ত না। অনেকে মনে করেন যে, খোটানের এই প্রাচীন ভাষাই হচ্ছে

শক জাতির মাতৃভাষা। শক জাতি ভারতবর্ষ জয় করবার পূর্ব্বে খোটান অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছিল, সুতরাং খোটানীয় ভাষায় যে তারা এক সময়ে কথা বলত, তাতে সন্দেহ নাই। সে যা হ'ক, এ ভাষা যে সংস্কৃত ভাষার প্রভাবেই সাহিত্যের বাহন হয়ে উঠেছিল, তা' নিঃসন্দেহে বলা যায়।

গোমতী-বিহার

খোটানে যে সব প্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিহার ছিল, তার মধ্যে অন্ততঃ দু'টি বিহারের নাম চীনা সাহিত্যে পাওয়া যায়—গোমতী-বিহার ও গোশৃঙ্গ-বিহার। গোশৃঙ্গ-বিহার বর্ত্তমান খোটান শহর হ'তে প্রায় ১৩ মাইল দূরে, কোমারি-মজর নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। এই বিহারের ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত প্রাকৃত ধম্মপদের পুঁথি পাওয়া গিয়েছিল। গোমতী-বিহার হয়-ত গোশৃঙ্গ-বিহারের চাইতে আরও বড় প্রতিষ্ঠান ছিল। কারণ খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে চীনা ভিক্ষুরা এই বিহারেই শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য আসতেন। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ ভাগে গোমতী-বিহারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তা থেকেই বোঝা যাবে, এ বিহার কি পরিমাণে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। ফা-হিয়ান যখন এ বিহারে অবস্থান করেন, তখন সে বিহারের

ভিক্ষুসংখ্যা তিন সহস্রের উপর। এই তিন সহস্র ভিক্ষুদের আহারের সময় ঘণ্টাধ্বনিতে আহ্বান করা হত। তিন সহস্র ভিক্ষু নিঃশব্দে ও ধীর পাদবিক্ষেপে বিহারে প্রবেশ করে তাদের আসন গ্রহণ করত ও তাদের ভিক্ষাপাত্র সাম্‌নে ধরত। অথচ, বিন্দুমাত্র শব্দ হ'ত না। আহার্য্যগ্রহণও নীরবে সাধিত হত।

গোমতী-বিহারের ভিক্ষুসংঘ ছিল মহাযানপন্থী। এই ভিক্ষুসংঘকে খোটানের রাজা অত্যন্ত ভক্তি করতেন। প্রতি বৎসর খোটানে বুদ্ধ-যাত্রা হত, সেই যাত্রায় খোটানের রাজা নিজে বেরুতেন ও গোমতী-বিহারে ভিক্ষুসংঘ সর্ব্বাগ্রে স্থান পেত। এই যাত্রার বর্ণনাও আমরা ফা-হিয়ানের বিবরণ হতে পাই। শহরের বাইরে প্রায় ত্রিশ হাত উঁচু রথ তৈরী হত। এ রথকে দূর হতে চলন্ত বৌদ্ধবিহারের মত দেখা যেত। চাঁদোয়া, সিল্কের পতাকা প্রভৃতি দিয়ে রথ সাজান হত। এই রথের মধ্যদেশে বুদ্ধমূর্ত্তি ও তার দু' দিকে বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি স্থাপন করা হত। এই বুদ্ধমূর্ত্তির পেছনে স্বর্ণ ও রৌপ্য-খচিত নানা দেবমূর্ত্তি বহন করে নেওয়া হত। এই রথ টেনে যখন শহরের প্রবেশ-দ্বারের নিকট নিয়ে আসা হত, তখন খোটানের রাজা স্বয়ং নিজের মুকুট নামিয়ে ফেলে নূতন ধৌত বস্ত্র পরিধান করতেন ও অনাবৃত পদে, গন্ধ-ধূপ হাতে

নিয়ে পার্ষদগণের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে বুদ্ধমূর্ত্তির পূজা করতেন এবং রথ সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন।

রথ নগরের মধ্যে প্রবেশ করতেই রাজমহিষী ও অন্যান্য নাগরিকাগণ বাতায়ন হতে রথের উপর পুষ্পবৃষ্টি করতেন। এই রথযাত্রা অতি সমারোহের সঙ্গে সম্পাদিত হত। গোমতী-বিহার ছাড়া খোটানের অন্যান্য বিহারের ভিক্ষুসংঘও বৎসরের অন্য সময়ে রথযাত্রা করত।

ফা-হিয়ানের বিবরণ থেকে বোঝা যায়, এ রথযাত্রা ছিল পুরীর জগন্নাথদেব বা নেপালের মৎস্যেন্দ্রনাথের রথযাত্রার মত যাত্রা। খোটানের রথের দেবতা ছিলেন বুদ্ধদেব, আর সে রথের বর্ণনা দেখে মনে হয়, সে রথ দেখতেও জগন্নাথদেব বা মৎস্যেন্দ্রনাথের রথের মতই ছিল। খুব সম্ভব প্রাচীনকালে ভারতবর্ষেও এই বুদ্ধরথযাত্রার প্রচলন ছিল ও সেই ভারতীয় রীতিই খোটানে প্রসার লাভ করেছিল।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যভাগে চিং-শেং নামীয় একজন চীনা লাট ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেন। তিনি খোটানে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আসেন। কারণ, তিনি শুনেছিলেন যে, খোটানের গোমতী-বিহার এমন একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যার তুলনা ভারতবর্ষেও খুব বেশী ছিল না। তিনি গোমতী-মহা-বিহারে আচার্য্য বুদ্ধসেনের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন। আচার্য্য

বুদ্ধসেন ছিলেন ভারতীয় ভিক্ষু এবং গোমতী-বিহারের সব চাইতে বড় মহাযান আচার্য্য। ধ্যানশাস্ত্রে ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞান এবং চিং-শেং-এর কথা বিশ্বাস করলে মানতে হবে যে, বুদ্ধসেন অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ গাথা আবৃত্তি করতে পারতেন। সমস্ত মধ্য-এশিয়ার ভিক্ষুসংঘ তাঁকে 'সিংহ' আখ্যা দিয়েছিল, কারণ, তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অতুলনীয়।

খোটান ও খোটানের গোমতী-বিহার যে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের সব চাইতে বড় শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, তাতে সন্দেহ নাই। কারণ, তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা চীনা বৌদ্ধ সাহিত্য হতে পাই। ভারতীয় ভিক্ষু ধর্ম্মক্ষেম খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যভাগে কাশ্মীর হতে সংবাদ পান যে, খোটানে মহাযান শাস্ত্রের চর্চ্চা ভারতবর্ষ হতেও বেশী হয়। সেই জন্য তিনি প্রথমে মধ্য-এশিয়া ও পরে চীনদেশে যান। চীনদেশের ভিক্ষুরা যখন তাঁকে 'মহাযাননির্ব্বাণসূত্র' অনুবাদ করতে অনুরোধ করল, তখন নির্ব্বাণসূত্রের দ্বিতীয় খণ্ড কোথাও পাওয়া গেল না। ধর্ম্মক্ষেম তখন খোটানে ফিরে এলেন, কারণ খোটান ছিল একমাত্র স্থান, যেখানে নির্ব্বাণসূত্রের পুঁথি পাওয়া যেত।

খোটানে সংস্কৃত ভাষায় মহাযানের মৌলিক গ্রন্থও লিখিত হত। সেরূপ কোন গ্রন্থ বর্ত্তমানে না পাওয়া গেলেও চীনা বৌদ্ধ সাহিত্যে তার উল্লেখ আছে। 'বৈপুল্যসূত্র' বা 'মহাসন্নিপাত'

মহাযানের একখানি বড় গ্রন্থ। এ গ্রন্থের সংস্কৃত মূল বিলুপ্ত হলেও সমগ্র গ্রন্থ চীনা অনুবাদে সংরক্ষিত হয়েছে। এ গ্রন্থের অংশবিশেষ খোটানে এবং খুব সম্ভব গোমতী-বিহারে সঙ্কলিত হয়েছিল, অনুমান করা হয়। মধ্য-এশিয়ার নানাস্থানে ও চীনদেশে আর একখানি মহাযান গ্রন্থের প্রচলন ছিল। এ গ্রন্থের নাম 'জ্ঞানী-মূর্খসূত্র'। এ সূত্র চীনা, তিব্বতী, মঙ্গোলীয়, কুচীয় প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল ও সে সমস্ত অনুবাদ এখনো পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের সংস্কৃত মূলও গোমতী-বিহারে সঙ্কলিত হয়েছিল।

নিয়া

ইতিপূর্ব্বে বলেছি যে, খোটানের নিকটবর্ত্তী যে সব স্থানে প্রাচীন যুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি ছিল খোটানীয় সভ্যতার নানা কেন্দ্র। এ সব ক্ষুদ্র কেন্দ্রের মধ্যে 'নিয়া' ছিল সব চাইতে প্রাচীন। 'নিয়া' খোটানের পূর্ব্বদিকে দক্ষিণ-বাহী পথের উপর অবস্থিত ছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের দিকে এই বর্দ্ধিষ্ণু জনপদ মরুভূমির গ্রাসে পড়ে ও পরিত্যক্ত হয়। এই জনপদের প্রাচীন অধিবাসীরা যে মূলতঃ ভারতীয় ঔপনিবেশিক ছিল এবং রাজবংশও যে ভারতীয় ছিল, তাতে সন্দেহ নাই, কারণ 'নিয়া' অঞ্চলে বালুকাস্তূপের মধ্যে



দান্দান্-উইলিকের চিত্র—পারসিকবেশে বজ্রপাণি-মূর্ত্তি (পৃঃ ৫৬)



খোটানের নিকটবর্ত্তী দান্দান উইলিকে প্রাপ্ত চিত্র—তান্ত্রিক দেবতা। (পৃঃ ৫৬)

খরোষ্ঠী লিপিতে যে রাজকীয় দলীলপত্র পাওয়া গিয়েছে, তার ভাষা ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের প্রাচীন প্রাকৃতভাষা। এ সব দলীলপত্রের একটু নমুনা দিলেই সে কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে—

মহনুঅব মহরয় লিহতি চোজ্‌বো সোংজকস মংত্র দেতি এবং চ জনংদো ভবিদব্য যো লিখমি স চ যহি অনতি দিদেমি রজকিচস কৃদেন তহ রজকর্যংমি রত্রদিবস ওসুক অবজিদব্য।

=মহানুভব মহারাজ চোজ্‌ব-সোংজককে মন্ত্র বা আদেশ দিয়ে লিখছেন—"সকলের জ্ঞাতার্থে লিখছি, আমার আজ্ঞা হচ্ছে এই যে, রাজকীয় কার্য্যের জন্য যেন সকলের রাত্রিদিবস ঔৎসুক্য থাকে।"

'নিয়া'র প্রাচীন রাজাদের এ অনুজ্ঞা যে অশোকের লেখমালার অনুজ্ঞার অনুরূপ, তা স্বীকার করতে হবে।

খোটানের নিকটবর্ত্তী রাওয়াক্ নামক স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। এই স্তূপে প্রাচীন যুগের ভাস্কর্য্যের যে সব নিদর্শন রয়েছে, তাতে সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। রাওয়াকে যে সব বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি পাওয়া যায়, তাকে ইন্দোগ্রীক আর্টের প্রকৃষ্ট নমুনা মনে করা হয়। এই ইন্দোগ্রীক আর্ট ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, বিশেষভাবে গান্ধার প্রদেশে খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এ আর্টকে ইন্দোগ্রীক

বলা হয়, তার কারণ, এ আর্ট ভারতীয়, অথচ তার রচনাশৈলী গ্রীসীয়। হয় ত গ্রীক শিল্পীদের কিংবা তাদের ভারতীয় শিষ্য-দের হাতে এ আর্ট গড়ে উঠেছিল। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি গুলির গ্রীক চেহারা, ও নানা ভাঁজে বিন্যস্ত পরিধেয় বস্ত্র হতেই স্পষ্ট গ্রীক প্রভাব ধরা পড়ে। এ কথা ঠিক যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ হতেই ভারতীয় সভ্যতা ও সেই সঙ্গে ভারতীয় আর্ট মধ্য-এশিয়ার নানাস্থানে প্রসার লাভ করেছিল। সেই কারণেই রাওয়াকের ধ্বংসস্তূপে আমরা সুস্পষ্টভাবে ইন্দোগ্রীক আর্টের নিদর্শন পাই। এ ছাড়া বিশুদ্ধ ভারতীয় আর্টের নমুনাও যে খোটান অঞ্চলে না পাওয়া যায়, তা নয়। যে গণপতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছে, তার উপর কোন বৈদেশিক প্রভাব নাই।

খোটান হতে নিয়ার পথে দান্দান উইলিক্ নামক স্থানে প্রাচীন যুগের বহু নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে। এখানে বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের খুব বড় প্রতিষ্ঠান ছিল এবং এখানকার প্রাচীন গুহা-মন্দিরে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের যে প্রাচীর-চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, তা খোটান-অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার প্রকৃষ্টতার পরিচয় দিচ্ছে। এই জাতীয় প্রাচীর-চিত্র আমরা পূর্ব্বে বামিয়েনের গুহামন্দিরে দেখেছি। দান্দান্-উইলিকে প্রাচীর-চিত্রে যে নাগী ও বোধিসত্ত্বদের চিত্র পাওয়া যায়, তা

সম্পূর্ণভাবে অজন্তার চিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়, তার ভিতর কোন বৈদেশিক প্রভাব নাই। কিন্তু, সেখানে অন্য প্রভাবের পরিচয়ও পাওয়া যায়। বিশেষতঃ সিল্কের উপর চিত্রিত যে বজ্রপাণি মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, তা যে পারসীক তা দেখলেই বোঝা যায়; বজ্রপাণির পোষাক, শ্মশ্রু ও লম্বা বুট সম্পূর্ণ পারসীক প্রভাবের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

খোটানের প্রাচীন ধর্ম্ম, সাহিত্য, ও শিল্প সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব পেয়েছিল এবং সেই প্রভাবেই খোটানীয় সভ্যতা পরিপুষ্টি লাভ করেছিল ও প্রায় হাজার বছরের উপর মধ্য-এশিয়ার নানা যাযাবর জাতিকে সভ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের শিক্ষা ও দীক্ষার ব্যবস্থা করেছিল।

খোটানীয় পণ্ডিত শিক্ষানন্দ

খোটান হ'তে সেকালে অনেক পণ্ডিত চীন দেশে যেতেন ও বৌদ্ধগ্রন্থের চীনা ভাষায় অনুবাদ-কার্য্যে সাহায্য করতেন। সে সব পণ্ডিতদের নাম চীনা ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়েছে এবং তন্মধ্যে শিক্ষানন্দের নামই বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

শিক্ষানন্দ খোটানে জন্মগ্রহণ করেন ও অতি অল্প বয়সে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন সুরু করেন। হীনযান

ও মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রে কালক্রমে তিনি এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন যে, মধ্য-এশিয়া ও চীনদেশে তাঁর তুলনা ছিল দুর্ল্লভ। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগে চীন সম্রাজ্ঞী বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের প্রসার-কার্য্যে উদ্যোগী হন ও জানতে পারেন যে, চীনা বৌদ্ধ-সাহিত্যে মহাযানের একখানি প্রধান গ্রন্থ—'অবতংসক-সূত্রে'র সম্পূর্ণ অনুবাদ নাই। তিনি অনুসন্ধানের ফলে সংবাদ পান যে, সে গ্রন্থের সম্পূর্ণ পুঁথি খোটানে পাওয়া যেতে পারে। তিনি তখন সে দেশ হ'তে সম্পূর্ণ পুঁথি আনবার জন্য দূত পাঠালেন ও সে পুঁথি চীনাভাষায় অনুবাদ করতে সক্ষম কোন পণ্ডিতকে চীন দেশে পাঠাবার জন্য খোটান-রাজকে অনুরোধ করলেন। ফলে, শিক্ষানন্দ চীন দেশের রাজধানীতে যাবার জন্য অনুরুদ্ধ হলেন।

শিক্ষানন্দ ৬০৫ খৃষ্টাব্দে চীনদেশের রাজধানীতে পৌঁছিলেন। অবতংসক-সূত্রের অনুবাদ-কার্য্যে তাঁকে সহায়তা করলেন—ভারতীয় আচার্য্য বোধিরুচি ও প্রসিদ্ধ চীনা পণ্ডিত ই-চিং। তিনি ৭০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় দশ বৎসর ধরে অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করে স্বদেশে ফেরেন। চার বৎসর পরে চীন দেশের নূতন সম্রাট্ শিক্ষানন্দকে পুনরায় চীন দেশে যেতে অনুরোধ

করে পাঠান। শিক্ষানন্দ রাজধানীতে পৌঁছিলে সম্রাট্ নিজে নগরদ্বার পর্য্যন্ত এসে তাঁকে সম্মানিত করেন। শিক্ষানন্দ তখন বৃদ্ধ, আর দুর্গম পথের ক্লান্তির জন্যই তিনি কোন নূতন অনুবাদ আরম্ভ করবার পূর্ব্বেই চীনদেশে মৃত্যুমুখে পতিত হন। শিক্ষানন্দ তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য চীনদেশে যে খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেছিলেন, তা' অনেকের ভাগ্যে ঘটেনি। তাঁর এই প্রতিষ্ঠা থেকে বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, খোটানে ভারতীয় বৌদ্ধ-শাস্ত্রের প্রসার ও আলোচনা ভারতবর্ষ হ'তে কোন ভাবে কম ছিল না।

শিক্ষানন্দের মৃত্যুর সময় চীনদেশের রাজধানীতে ছিলেন খোটানের এক রাজকুমার। তিনি ছিলেন চীন-রাজসরকারে খোটানরাজের প্রতিভূ। ৭০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি চীন সম্রাটের অনুমতি নিয়ে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেন; এই সময়ে তাঁর নাম হয় 'জ্ঞানালঙ্কার'। ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করবার পর জ্ঞানালঙ্কার নিজের প্রাসাদ বৌদ্ধ বিহারে পরিবর্ত্তিত করেন ও শাস্ত্রাধ্যয়নে দিনাতিপাত করতে থাকেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হয়ে অন্য বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা জ্ঞানালঙ্কারকে বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদ করবার জন্য আহ্বান করেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থ এখনো চীনা বৌদ্ধ-সাহিত্যে সংরক্ষিত হয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিচ্ছে।

তুন্-হোয়াংএর পথে

নিয়া হ'তে তুন্-হোয়াং পর্য্যন্ত দক্ষিণবাহী পথের উপর অবস্থিত নানা দেশ প্রাচীনকালে জনবহুল থাকলেও খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের দিকে সে সব স্থান পরিত্যক্ত হয়েছিল। মরুভূমি এ সব স্থানকে ক্রমশঃ গ্রাস করে ফেলছিল এবং সেই কারণে অধিবাসীরা স্বদেশ পরিত্যাগ করে মধ্য-এশিয়ার অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ছিল। এ দেশের অবস্থা হিউয়ান্-সাং-এর বর্ণনা হতে আরও স্পষ্ট বোঝা যাবে। হিউয়ান্-সাং লিখেছেন—"নিয়া হ'তে পূর্ব্বমুখে যেতেই বিশাল মরুভূমির আরম্ভ। এ মরুভূমির বালুকারাশি প্রায় সর্ব্বত্রই প্রবল বায়ুর দ্বারা চালিত হয়ে ঘূর্ণীচক্র সৃষ্টি করছে ও মরুভূমিকে আচ্ছন্ন করছে। এই কারণে পথের কোন চিহ্ন চোখে পড়ে না ও পথিকেরও প্রায়শঃই দিগ্-ভ্রান্তি হয়। নানাস্থানে পথিক ও যানবাহী জন্তুর পরিত্যক্ত কঙ্কালের সাহায্যে পথের নিশানা পাওয়া যায়। এ মরুভূমির কোথাও এক বিন্দু জল অথবা তৃণাচ্ছাদিত ভূমি-খণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায় না। কথনো কখনো মরুভূমির উত্তপ্ত বায়ু এমন প্রবলভাবে বইতে থাকে যে, পথিক ও যানবাহী জন্তুরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই বায়ুর শোঁ শোঁ শব্দ প্রেতলোকের

হতাশ ক্রন্দন-ধ্বনির মত পথিকের চিত্তে ভীতির সঞ্চার করে।"

এই পথের উপর যে-সব দেশ অবস্থিত ছিল, সে-সব দেশের নাম হিউয়ান্-সাং উল্লেখ করেছেন—তুখার জাতির প্রাচীন দেশ, ছে-মো-তো-নো (ছল্মদন—বর্ত্তমান চেরচেন্) ও নব-নোর বা লবণ-হ্রদের নিকটে অবস্থিত শেন্-শেন্। তুখার জাতি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্ব্বে এই প্রদেশে বাস করত। পরে নানা জাতির আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে এবং বোধ হয় সে দেশ আংশিকভাবে মরুভূমির কবলে পতিত হওয়ায় তারা স্বদেশ পরিত্যাগ করে মধ্য-এশিয়ার পশ্চিম-প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে তারা বক্ষু নদীর তীরে রাজ্য বিস্তার করেছিল, সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলেছি। হিউয়ান্-সাং যখন এই পথে যান, তখন তুখারদের প্রাচীনদেশ মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। রাজধানী ধ্বংসস্তূপ, সেখানে মানুষের চিহ্নমাত্র ছিল না। অথচ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্ব্বে এই দেশ হতে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত যে চীনদেশে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ চীনা ইতিহাসেই পাওয়া যায়।

ছে-মো-তো-নো দেশের প্রকৃত নাম নিয়া অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাচীন পুঁথি-পত্রে পাওয়া গিয়েছে। এ নাম হচ্ছে ছল্মদন, চীনা রূপান্তর আনুবর্ণিক না হলেও প্রায় ঠিক। ছল্মদন

দেশের সঙ্গে খোটান অঞ্চলের নানা ক্ষুদ্র রাজ্যের যে, রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল, সে কথা ঐ প্রাচীন পুঁথিপত্র হতে অবগত হওয়া যায়। হিউয়ান্-সাং এর সময় ছল্মদন দেশও প্রাচীন তুখার দেশের অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। সে দেশ তখন জনশূন্য, রাজধানী পরিত্যক্ত ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এ দেশের কোন প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় নি, সেই কারণে প্রাচীন সভ্যতায় কতটা ভারতীয় প্রভাব ছিল তা-ও জানা যায় না। তবে খোটানের প্রাচীন পুঁথি-পত্র হতে যতটা বোঝা যায়, তাতে মনে হয় এদেশেও খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্ব্বে একটি ভারতীয় উপনিবেশ ছিল, এবং তাদের কথ্য ভাষা ছিল নিয়া অঞ্চলে প্রচলিত প্রাকৃতের অনুরূপ কোন প্রাকৃত-ভাষা।

ছল্মদন হ'তে আরও পূর্ব্বে দক্ষিণবাহী পথের উপর অবস্থিত হচ্ছে শেন্-শেন্ প্রদেশ। এ দেশের প্রাচীন নাম চীনাভাষায় রূপান্তরিত হয়ে ল্যু-লান নামে উল্লিখিত হয়েছে। এ নামের প্রকৃত রূপ কি ছিল জানা যায় নি। তবে এ দেশ প্রাচীনকালে একটি বর্দ্ধিষ্ণু জনপদে পরিণত হয়েছিল। পরে এ দেশের অধিবাসীরা যখন তাদের স্বাধীনতা হারায় ও এ দেশ চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন তার নূতন চীনা নামকরণ হয় শেন্-শেন্।



দান্দান্-উইলিক : প্রাচীর-গাত্রে অঙ্কিত মূর্ত্তি : খোদিত লিপি দ্রষ্টব্য (পৃঃ ৫৬



কুচার নিকটে মিং-উই গুহামন্দিরে প্রাচীর-চিত্র (পৃঃ ৬৯)



মিরান (খৃষ্টাব্দ ৪র্থ শতক) : জাতক (পৃঃ ৬৩)



খোটানের নিকটে রাওয়াক্-স্তূপ, বালুকাস্তূপের ধারে বৌদ্ধ মূর্তি (পৃঃ ৪৫)

এই দেশের অন্তঃপাতী মিরান নামক স্থানে প্রাচীন যুগের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। মিরানের প্রাচীন বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসস্তূপ হ'তে নানাযুগের বৌদ্ধ-শিল্পের যে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে, তা' খোটান অঞ্চলের আর্টের সঙ্গে তুলনীয়। মিরানের নিদর্শনগুলি দু'টি বিশিষ্ট যুগের ;—কতকগুলি হচ্ছে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পূর্ব্বেকার। এ যুগের প্রাচীর-চিত্রের যে সব নমুনা আবিষ্কৃত হয়েছে তার উপর চীনা বা তিব্বতী প্রভাব নাই। সে যুগের আর্ট গড়ে উঠেছিল মূলতঃ দু'টি প্রভাবে—ভারতীয় ও গ্রীসীয়। মিরান অঞ্চলের কোন কোন চিত্রকে পম্পেইতে প্রাপ্ত প্রাচীর-চিত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু, গ্রীসীয় বা রোমক প্রভাব মিরান পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল গান্ধার অঞ্চলের শিল্পীদের হাতে। মিরানের অন্যান্য শিল্প-নিদর্শনগুলি খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতকের। এ যুগের শিল্প ভারতীয় সভ্যতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও তার উপর চীনা ও তিব্বতী প্রভাবই বেশী।

এই সব নিদর্শন হ'তে বেশ বোঝা যায় যে, প্রাচীনকালে মিরান প্রদেশে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছিল ও সেই সঙ্গে ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতিও সে প্রদেশে পৌঁছেছিল। চীনযাত্রী বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা মরুভূমি অতিক্রম করার পর এখানে আশ্রয়লাভ করত। শেন্-শেন্ হ'তে

বেরিয়ে এই ভিক্ষুরা একটা ছোট মরুভূমি পার হয়ে তুন্-হোয়াং এর পথ ধরতেন। তুন-হোয়াং ছিল চীনের সীমান্তে অবস্থিত এবং পূর্ব্বেই বলেছি যে, তুন-হোয়াং ছিল সেকালে উত্তরবাহী ও দক্ষিণবাহী দুই পথের সন্ধিস্থল। এইবার উত্তরবাহী পথের উপর যে সব রাজ্য অবস্থিত ছিল, তার পরিচয় দিয়ে পরে তুন-হোয়াং এর প্রাচীন বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠানের কথা বলব।

*

কাশগর হ'তে যে পথ উত্তরবাহী হয়ে চীনের সীমান্তে তুন-হোয়াং পৌঁছেছে, সে পথের উপর প্রাচীনকালে বহু জনপদ অবস্থিত ছিল। এই সব জনপদ কালক্রমে শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়েছিল এবং তন্মধ্যে কোন কোন রাজ্য বহুদিন ধরে স্বাধীনতার জন্য চীন সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়েছিল। এই সব জনপদের মধ্যে ভরুক, কুচী ও অগ্নিদেশ বিখ্যাত।

কাশগর হ'তে ভরুক (অক্সুর নিকটবর্ত্তী ইয়াক-আরিক্) পর্য্যন্ত যে পথ গিয়েছে, সে পথের উপরে মারালবাশির নিকটে তুমচুক নামক স্থানে প্রাচীন যুগের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এ অঞ্চলে প্রাচীনকালে যে কোন প্রতিষ্ঠাপন্ন জনপদ বা নগর ছিল তা'তে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে জনপদের প্রাচীন নাম অতীতের কবল হ'তে এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। তুমচুকে পাহাড়ের গায়ে প্রাচীন বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসস্তূপ খনন

করে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের নানা মূর্ত্তি ও বৌদ্ধজাতকের নানা গল্পের প্রাচীর-চিত্র আবিষ্কার করা হয়েছে। এ সব প্রাচীর-চিত্র দান্দান-উইলিক ও খোটানের অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত প্রাচীর-চিত্রের অনুরূপ ; তার উপর স্থানীয় প্রভাব থাকলেও তার মূল অনুপ্রেরণা এসেছিল ভারতীয় শিল্পীদের থেকে। ভাস্কর্য্যের যে নমুনা পাওয়া গিয়েছে, তা হতে স্পষ্টই ধরা যায় যে এ অঞ্চলে ভাস্কর্য্যের যে ধারা অনুসৃত হয়েছিল তা হচ্ছে ইন্দো-গ্রীক সম্প্রদায়ের এবং সে ধারাও এসেছিল ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশ হতে।

কুচী ও অগ্নিদেশ

উত্তরবাহী পথের উপর যে সব জনপদ অবস্থিত ছিল, তার মধ্যে ভরুক (=ইয়াক-আরিক্), কুচী (=কুচার) ও অগ্নিদেশ (=কারাশর) ছিল প্রসিদ্ধ। এই তিন দেশের ভাষা, শিক্ষা ও দীক্ষা ছিল অনুরূপ এবং এ তিন দেশে যে জাতি বাস করত, সে জাতি অধুনালুপ্ত হলেও প্রায় হাজার বছরের উপর ধরে, মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়েছিল। এ তিন দেশের মধ্যে কুচী ছিল সর্ব্ব-প্রধান, আর সে দেশের অধিবাসীরা চীনা ইতিহাসে 'গৌরবর্ণ জাতি' হিসাবে খ্যাত হয়েছে। ভরুক ও অগ্নি—এই দুই দেশের অধিবাসীরা যে কুচীয় জাতির অনুরূপ ছিল, সে কথা চীনা ঐতিহাসিকেরাই বলে গিয়েছেন। এই তিন দেশে একই ভাষার তিনটি শাখা-ভাষা প্রচলিত ছিল। ভরুকদেশের ভাষার কোন নমুনা পাওয়া যায় নি, তবে কুচী ও অগ্নিদেশের ভাষায় লিখিত বহু খণ্ডিত বৌদ্ধগ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে এবং সেই সব পুঁথিপত্রের প্রাচীন ভাষার উদ্ধারসাধন করা হয়েছে।

এই ভাষা ইরাণীয় বা ভারতীয় ভাষা হ'তে উদ্ভূত নয়, এ ভাষা হচ্ছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর এমন একটি

শাখা, যা এখন লুপ্ত, কিন্তু সে শাখা ইরাণীয় বা ভারতীয় ভাষা হ'তে পৃথক্, বরং গ্রীক্ লাতিনের অনুগামী। এ কথা কুচীয় ভাষার সংখ্যাগুলির নাম করলেই বোঝা যাবে—১—যেমে, ২—বি, ৩—ত্রৈ, ৪—শ্ত্বার, ৫—পিশ্, ৬—ষকৃশ, ৭—ষুকৃধ, ৮—অকৃধ ৯—এঞু, ১০—শক্, ১০০....কন্তে। এই সব শব্দের মধ্যে "কন্তে" ও সংস্কৃত "শত" একই মূল ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ হতে উদ্ভূত হলেও "কন্তে" যে লাতিন্ Cent (কেন্ত) শব্দেরই নিকটবর্ত্তী, তাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন কালে কুচায়ে প্রচলিত এই নূতন ভাষাকে কুচীয় (Kuchean) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অগ্নিদেশ বা কারাশর অঞ্চলে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাও কুচীয় ভাষার অনুরূপ—সে ভাষাকে কোন কোন পণ্ডিত "তুখারীয়" (Tokharian) আখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু সম্প্রতি প্রায় সকলেই সে ভাষাকে "অগ্নিক" (Agnean) আখ্যা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন।

যা হ'ক এ সব দেশে প্রচলিত ভাষার আলোচনা থেকেই বুঝতে পারি যে, এ অঞ্চলে যে জাতি বাস করত, তারা ছিল প্রাচীন ইরাণীয় ও ভারতীয়দের মত একটি আর্য্য জাতি। সে জাতি ছিল সুদর্শন, গৌরবর্ণ ও নীলচক্ষু। সে জাতি মধ্য-এশিয়ার অন্যান্য জাতি হতে অনেক বেশী সভ্য ছিল, এবং

তাদের হাতে ভারতীয় সভ্যতা নূতন রূপ গ্রহণ করেছিল। সে জাতির রুচি ছিল মার্জ্জিত, তাদের বেশভূষার পারিপাট্য ছিল, কারণ তারা যে পশমের ও সিল্কের বস্ত্র বয়ন করত, তা বিদেশেও বিশেষ আদরের বস্তু ছিল। উপরন্তু, সে জাতি ছিল সঙ্গীতপ্রিয়।

এই সুসভ্য জাতির একটি শাখা প্রাচীন ভরুক অঞ্চলে বসবাস করত। চীনা ইতিহাসে এই দেশের নাম "পো-লু-ক" হিসাবে রূপান্তিত হয়েছে। বহু দিন ধরে পণ্ডিতেরা মনে করেছিলেন যে, এ শব্দ "বালুকা" শব্দের রূপান্তর। কিন্তু, সম্প্রতি মধ্য-এশিয়ায় প্রাপ্ত সংস্কৃত পুঁথি-পত্র হতে প্রকৃত নাম যে "ভরুক" তা খুঁজে বের করা হয়েছে। অনেকে এতটা অনুমান করেছেন যে, এ নামের সঙ্গে ভারতের প্রাচীন বন্দর ভরুকচ্ছের নামের যোগাযোগ আছে এবং সম্ভবতঃ ভরুকচ্ছের লোকেরা এ দেশে উপনিবেশ বিস্তার করেন ও এ দেশের ভরুক নামকরণ করেন। এ অনুমানের কোন ভিত্তি আছে কি না তা হয়ত একদিন ইয়াক-আরিক্ অঞ্চলে বালুকা-স্তূপ খুঁজলে বোঝা যাবে।

হিউয়ান-সাং এই ভরুকদেশের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এ অঞ্চলে সর্ব্বাস্তিবাদ-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম

শতকের প্রথম ভাগে ভরুক শহরে অন্যূন দশটী বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। ইউয়ান-সাং-এর কথা সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করলে মানতে হবে যে, এ দেশের আচার-ব্যবহার, ও কথ্য ভাষা ছিল কুচীদেশের অনুরূপ এবং পণ্ডিতেরা যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন, তাও ছিল কুচীদেশে প্রচলিত বৌদ্ধশাস্ত্রের নানা গ্রন্থ।

ভরুক অঞ্চলে বিশেষভাবে অনুসন্ধান চালানো হয় নি বলেই প্রাচীনযুগের আর্টের কোন নিদর্শন বা পুঁথিপত্রের কোন নমুনা এখনো পাওয়া যায় নি। তবে ভরুক হতে কুচারের মধ্যপথে কিজিল নামক স্থানে প্রাচীন আর্টের যে সব নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে যে ভরুকদেশের শিল্পীদের হাত ছিল না তা বলা যায় না।

কুচীরাজ্য

পূর্ব্বেই বলেছি যে কুচী-রাজ্য ছিল মধ্য-এশিয়ার উত্তর-বাহী পথের উপর নানা রাজ্যের মধ্যে প্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। এ দেশের নাম নানারূপে বৈদেশিক সাহিত্যে উল্লিখিত হয়েছে—যথা, চীনা সাহিত্যে—কু-চি, কুয়েই-ৎস; তুর্কীদের প্রাচীন সাহিত্যে কুস, কুশ, ইত্যাদি। এ দেশের প্রকৃত নাম মধ্য-এশিয়ায় আবিষ্কৃত খণ্ডিত সংস্কৃত পুঁথিতে

কুচী হিসাবে পাওয়া গিয়াছে ; এ পুঁথিতে কুচী দেশের রাজাকে বলা হয়েছে কুচীশ্বর, কুচীমহারাজ। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায়, উত্তর প্রদেশে যে সব জাতি বাস করত তাদের নামের মধ্যে 'কুশিক' জাতির নামের উল্লেখ পাই। হয়ত এই কুশিক ও কুচীক, উভয় জাতি ছিল অভিন্ন। এ রাজা বহুকাল ধরে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চীন সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়েছিল এবং সে যুদ্ধের ফলাফল যে সব সময়েই তার বিপক্ষে গিয়েছিল তা নয়। চীনা-সাহিত্যে এ দেশ, এ দেশের প্রাচীন জাতি ও তার সভ্যতা সম্বন্ধে নানা উল্লেখ আছে এবং সেই সব উল্লেখ ও মধ্য-এশিয়ায় প্রাপ্ত নানা পুঁথিপত্রের সাহায্যে এ দেশের ইতিহাসের কথঞ্চিৎ উদ্ধার সাধন করা হয়েছে।

এ দেশের প্রাচীন জাতিকে চীনারা 'গৌরবর্ণ জাতি' এই আখ্যা দিয়েছিল ; তাদের চোখ ছিল নীলবর্ণ এবং চুল ছিল সোনালী। সুতরাং সে জাতি যে চীনাদের জ্ঞাতি-ভাই ছিল না তা নিশ্চিত। পূর্ব্বেই বলেছি, তাদের ভাষা ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় ; সুতরাং সে জাতিকে যদি আমরা আর্য্য বলি তা হলে ভুল হবে না। কুচীরাজ্যের, এই আর্য্যজাতির ভাষা সংস্কৃত হতে পৃথক্ হলেও তারা খৃষ্টীয় প্রথম, দ্বিতীয় শতকে

বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল এবং সেই সঙ্গে নিজেদের দেশে ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপি ও সংস্কৃত ভাষার প্রচলন করেছিল।

প্রাচীন কুচীরাজ্য ছিল বিশেষ সমৃদ্ধ; সে দেশে যব, গম, ধান ও নানাপ্রকার ফল-ফুল ত জন্মাতই, তা ছাড়া নানা জাতীয় ধাতুজ পদার্থ সে দেশ হতে অন্যত্র রপ্তানী হত। বয়নশিল্পে মধ্য-এশিয়ার নানা জাতির মধ্যে কুচীকেরা ছিল শ্রেষ্ঠ। এই কারণে এ দেশের উপর বাইরের নানা জাতির চোখ পড়েছিল এবং তারা কুচীরাজ্যকে গ্রাস করবার চেষ্টা করেছিল।

চীনা ইতিহাসের প্রমাণ হতে আমরা বুঝতে পারি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতক হতে খৃষ্টীয় দশম শতক পর্যান্ত এ জাতি তাদের নিজেদের সত্তা ও স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতকে তুর্কী জাতির আক্রমণে কুচীরাজ্য সম্পূর্ণ ভাবে বিধ্বস্ত হয় ও সে রাজ্যের অধিবাসীরা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে ক্রমশঃ তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। সে অবধি সে জাতির কোন নিদর্শন বিংশ-শতক পর্য্যন্ত আর কারু চোখে পড়ে নি। এ দেশের প্রাচীন রাজাদের নাম ধারাবাহিক ভাবে না পেলেও খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে যে সব রাজা রাজত্ব করেছিলেন, তাদের নাম পুরাণো ছিন্ন পত্রে পাওয়া

গিয়েছে। এ সব নাম ভারতীয়—যথা—স্বর্ণতে (=স্বর্ণদেব) অরতে (=হরদেব), সুবর্ণপুষ্প, হরিপুষ্প, ইত্যাদি।

বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল এ দেশে প্রবল। সে ধর্ম্ম মূলতঃ ছিল সর্ব্বাস্তিবাদ-সম্প্রদায়ের এবং সেই সম্প্রদায়ের সংস্কৃত বৌদ্ধ-গ্রন্থের নানা সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ এবং খণ্ডিত পুঁথি কুচারের প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ হতে আবিষ্কৃত হয়েছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে এ দেশে মহাযান ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। কিন্তু তা'তে সর্ব্বাস্তিবাদের প্রসার কমে নি। হিউয়ান্-সাংএর কথা সত্য হলে বুঝতে হবে যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে কুচী-রাজ্যের রাজধানীতে শতাধিক বৌদ্ধবিহার ছিল, এবং ভিক্ষুদের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারের উপর। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধবিহার ছিল আশ্চর্য্যচিহার, এবং এ বিহার নির্ম্মিত হয়েছিল, গান্ধার রাজ্যের রাজধানী পুরুষপুরের বিখ্যাত কণিষ্ক-বিহারের অনুকরণে। এই বিহারের ভিক্ষু ছিলেন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং বিহার বহু বুদ্ধমূর্ত্তি ও নানা চিত্রে সুশোভিত ছিল।

কুচীরাজ্যের বৌদ্ধভিক্ষুরা সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করলেও নিজেদের মাতৃভাষা বর্জ্জন করেন নি; বরং সে ভাষাকে সাহিত্যের বাহন করবার চেষ্টা করেছিলেন। সেই কারণে কুচী অঞ্চলে বৌদ্ধশাস্ত্রের যে সমস্ত পুঁথিপত্র পাওয়া গিয়েছে

তাতে আমরা সংস্কৃত মূল ও তার কুচীয় অনুবাদ পাশাপাশি পাই। একটি নমুনা দিলেই এ কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে—

কস্তম্ নিন্দিতুম্ অর্হতি—"কুসে চৌ নাকৃৎসি অর্চন্ত্র্"…।

এই অনূদিত সাহিত্যই হচ্ছে কুচীয় ভাষার একমাত্র সাহিত্য। বৌদ্ধ সাহিত্য ছাড়া সে ভাষায় যে আর কোন সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ নাই।

প্রাচীন কুচীয় জাতি ভারতবর্ষ হতে যে শুধু ধর্ম্ম, লিপি, ভাষা ও সাহিত্য নিয়েছিল তা নয়। মধ্য-এশিয়ার নানা জাতির মধ্যে সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তাদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাদের মধ্যে নানা প্রকারের যন্ত্র-সঙ্গীত ও কণ্ঠ-সঙ্গীতের প্রচলন ছিল। সঙ্গীতে তাদের অদ্ভুত পারদর্শিতা সম্বন্ধে চীনা সাহিত্যে নানা উল্লেখ আছে। বর্ষাকালে যখন বৃষ্টিপাত সুরু হত তখন কুচী সহরের সন্নিহিত পর্ব্বতমালায় নানা জলপ্রপাত পরিপূর্ণ হয়ে উঠত, আর কুচীয় সঙ্গীতজ্ঞেরা সেই জলপ্রপাতের শব্দকে অতি নিপুণ ভাবে সঙ্গীতে রূপান্তরিত করত। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে চীনা সম্রাট্ নানা দেশের সঙ্গীত শোনবার জন্য এক বিরাট 'জলসা'র আয়োজন করেন। এই 'জলসা'য় জাপান, কম্বুজ, কাশগর, সুগদ প্রভৃতি দেশ হতে শিল্পীরা আসেন এবং তৎসঙ্গে কুচীর

শিল্পীরাও আসেন। সে 'জলসা'য় কুচীক শিল্পী এমন দক্ষতার সঙ্গে নানা যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীত করেন যে, পরিশেষে তাঁরাই সভায় শ্রেষ্ঠ আসন পান। কুচীয় সঙ্গীতের অন্ততঃ ২০টী বিভিন্ন সুরের উল্লেখ চীনা সাহিত্যে রয়েছে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে সুজীব নামক এক কুচীয় শিল্পী চীনদেশে যান। চীনসাম্রাজ্ঞী কুচীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁকে অনেক প্রশ্ন করেন এবং সুজীব তাঁকে বলেন যে, কুচীয় সঙ্গীতে সাতটী সুর-গ্রাম আছে। এই সুর-গ্রামগুলির যে নাম চীনা সাহিত্যে উল্লিখিত হয়েছে, তন্মধ্যে ষষ্ঠ সুরের নাম হচ্ছে পন্-চেন্ (=পঞ্চম), তৃতীয়ের নাম—স'-লি-ছ (=ষড়জ), সপ্তম—বৃষ, এবং চতুর্থ—সহগ্রাম। এ সব নাম যে ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্র হতে গৃহীত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই, হয়ত তাদের প্রয়োগ ছিল কিছু পৃথক্।

ভরুক হতে কুচী পর্য্যন্ত নানাস্থানে, বিশেষতঃ কিজিল নামক স্থানে নানা গুহামন্দিরে প্রাচীন কুচীয় জাতির শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব গুহামন্দিরকে বর্ত্তমানে তুর্কীভাষায় মিং-উই বলা হয়; এ কথার অর্থ "হাজার মন্দির" এবং স্থানে স্থানে এই সব গুহামন্দির যে সংখ্যায় হাজার না হলেও খুব বেশী ছিল তাতে সন্দেহ নাই। কিজিলের মিং-উইতে যে প্রাচীরচিত্রের নিদর্শন আছে

তা'তে ভারতীয় প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। তার মধ্যে অবশ্য পারসিক, রোমক, কিংবা চীনা প্রভাব আছে, কিন্তু সে চিত্র-কলা যে ভারতীয় শিল্পের অনুপ্রেরণা পেয়েছিল তা' নিঃসন্দেহে বলা চলে।

এ প্রদেশে ভাস্কর্য্যের যে নমুনা পাওয়া যায় তা গান্ধারের ইন্দো-গ্রীক রীতির অনুবর্ত্তী। সুতরাং চিত্রকলায় ও ভাস্কর্য্যে ভরুক হ'তে অগ্নিদেশ পর্য্যন্ত আর্য্যজাতির যে অধুনালুপ্ত শাখা বিস্তার লাভ করেছিল তার মধ্যেও ভারতীয় শিল্পের ধারা অনুসৃত হয়েছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসারে কুচীরাজা বিশেষ উৎসাহী ছিল, এ-ধর্ম্ম যে সে দেশে শুধু রাজার ধর্ম্ম ছিল তা নয়, সমস্ত দেশবাসী এ ধর্ম্মকে গ্রহণ করেছিল। নানা সংঘারামে বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের অতি গভীর আলোচনা করতেন, এবং সে আলোচনা ঘনীভূত হয়ে উঠত যখন ভারতীয় পণ্ডিতেরা তাতে যোগদান করতেন। চীনগামী বহু ভারতীয় শ্রমণ এ দেশের নানা বিহারে সাময়িকভাবে অবস্থান করতেন এবং তাঁদের সহায়তা হতে কুচীয় পণ্ডিতেরা বঞ্চিত হতেন না। প্রথম যুগে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে যে সব বৌদ্ধ পণ্ডিত চীন দেশে যান ও বৌদ্ধশাস্ত্রের চীনা অনুবাদ করেন, তাঁদের মধ্যে অনেক কুচীয় পণ্ডিত ছিলেন এবং

এ সব পণ্ডিতের নাম চীনা বৌদ্ধসাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এ সব কুচীয় পণ্ডিতের মধ্যে কুমারজীব ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কুমারজীব খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষভাগের লোক।

কুচীয় পণ্ডিত কুমারজীব

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এক ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্যে এক ব্রাহ্মণ পরিবার উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিলেন। সেই বংশের লোকেরা বংশানুক্রমে ছিলেন রাজার গুরু ও মন্ত্রী, বিদ্যাবুদ্ধিতে দেশের মধ্যে অগ্রণী, এবং সেইজন্য সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। এই কুলশীল-সম্পন্ন বংশে কুমারায়ণ জন্মগ্রহণ করলেন ও নিজের শিক্ষা-দীক্ষায় বংশ-মর্য্যাদাকে আরো বাড়িয়ে তুললেন। কিন্তু, ভাগ্যচক্রের বিবর্ত্তনে তাঁকে দেশ ছাড়তে হ'ল। জ্ঞাতিবর্গ তাঁর প্রতিষ্ঠা সইতে পারল না। তাদের নানারূপ দুর্ব্যবহারে কুমারায়ণ স্বেচ্ছায় ধনসম্পত্তি পরিত্যাগ করলেন ও বৌদ্ধ-ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করে' সংসার ছাড়লেন। বৌদ্ধবিনয়ের কঠোর শাসন মানতে গেলে কোন ভিক্ষুর একস্থানে বহুদিন ধরে বসবাস করবার নিয়ম ছিল না। কারণ, তাতে পুনরায় সংসারের আবর্ত্তনে পড়বার ভয় ছিল। তাই ভিক্ষুর জীবন ছিল পর্য্যটকের জীবন; কুমারায়ণও এই জীবন বরণ করে

নিলেন। ভারতের গণ্ডী কুমারায়ণকে আবদ্ধ করে রাখতে পারল না। বাইরের দেশের সঙ্গে ভারতের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে তিনি বহুদিন ধরে দেশবিদেশের সার্থবাহদের যাতায়াত লক্ষ্য করেছিলেন ও বিদেশের খবর নিয়েছিলেন। তাই এদিনে বিদেশই তাঁকে সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ করল ও তিনি বিদেশের অজ্ঞাতপথে যাত্রা করলেন। নানা দেশ অতিক্রম করে হিমাদ্রির চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গসমূহ পার হ'য়ে তিনি অবশেষে মধ্য-এশিয়ায় কুচীরাজ্যে উপস্থিত হলেন।

কুমারায়ণ যখন সে রাজ্যে উপনীত হলেন, তখন তার এক গরিমাময় যুগ চলছে। রাজধানী বিশাল নগরী; সে নগরী ধনে মানে ও ঐশ্বর্য্যে মধ্য-এশিয়ায় শীর্ষস্থানীয়। আর, তার অধিবাসীরা শিক্ষা-দীক্ষায় সভ্যতার চরম শিখরে উঠেছে। ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম তাদের ধর্ম্ম, আর সংস্কৃত তাদের দেবভাষা। রাজধানীতে ভারতবর্ষ থেকে এক বড় পণ্ডিত এসেছেন শুনে সে দেশের রাজা নিজে বেরিয়ে এসে কুমারায়ণকে অভ্যর্থনা করলেন ও রাজপুরোহিতের পদ গ্রহণ করে সে দেশে বসবাস করতে অনুরোধ করলেন। কুমারায়ণও সে পদ সানন্দে গ্রহণ করলেন।

কুচী-সম্রাটের ভগ্নী জীবা, তাঁর বয়স ২০ বৎসর। তাঁর রূপ ও গুণের খ্যাতি রাজধানীর বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

তিনি কুমারায়ণকে পতিরূপে বরণ করলেন। কুমারায়ণ ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করে আবার সংসার-ধর্ম্ম গ্রহণ করলেন। কালক্রমে কুমারায়ণ ও জীবার দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করল—পিতা ও মাতার নামে জ্যেষ্ঠপুত্রের নামকরণ হল কুমারজীব। দুই পুত্র ভূমিষ্ঠ হবার পরেই জীবা সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষুণী হলেন ও কুমারজীবের শিক্ষার ভার নিয়ে বৌদ্ধবিহারে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

শিশুকাল থেকেই কুমারজীবের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল। সাত বৎসর বয়সেই তিনি শিক্ষায় প্রতিষ্ঠালাভ করলেন ও বহু শাস্ত্রগ্রন্থ আয়ত্ত করলেন। কুচায় থাকলে যে কুমারজীব শিক্ষায় আর অধিক দূর অগ্রসর হ'তে পারবেন না, একথা জীবা বুঝতে পারলেন ও পুত্রকে নিয়ে কাশ্মীরে উপনীত হ'লেন। কারণ, বিদেশে তখন কাশ্মীর ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র বলে পরিচিত ছিল। কাশ্মীরের রাজার ভাই বন্ধুদত্ত তখন কাশ্মীরে সব চাইতে বড় পণ্ডিত। কুমারজীবের শিক্ষার ভার তাঁরই হাতে ন্যস্ত হ'ল। তাঁর তত্ত্বাবধানে কুমারজীব বৌদ্ধশাস্ত্রে শীঘ্রই পারদর্শী হ'য়ে উঠলেন। অন্যান্য পণ্ডিতদের সাহচর্য্যে বেদ, দর্শন ও জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতি আয়ত্ত করলেন এবং রাজপ্রাসাদে পণ্ডিতসভায় তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করে' খ্যাতি অর্জ্জন করলেন।



বামিয়েনের গুহা-মন্দিরে প্রাচীর-চিত্র (পৃঃ ২০)

কুমারজীবের শিক্ষা শেষ হ'লে জীবা তাঁকে নিয়ে স্বদেশে ফিরবার মনস্থ করলেন। কাশ্মীর থেকে উত্তরাভিমুখে রওনা হ'য়ে তাঁরা শকদের দেশে উপস্থিত হ'লেন। পথে এক বৌদ্ধ অর্হতের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হ'ল ও অর্হৎ, কুমারজীব যে অশেষ প্রতিভাশালী ব্যক্তি, সে সম্বন্ধে অনেক ভবিষ্যৎ বাণী করলেন। পথ অতিক্রম করবার সময় মধ্য-এশিয়ার নানাদেশ থেকে পণ্ডিতেরা এসে কুমারজীবের সঙ্গে দেখা করলেন ও নানা দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর নিকট নূতন কথা শুনলেন। ইয়ারকন্দ প্রদেশের দুই রাজপুত্র সূর্য্যভদ্র ও সূর্য্যসোম এই সময়ে তাঁর নিকট মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

দেশে ফিরবার পর কুমারজীব কুচীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় বৌদ্ধ বিহারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কার্য্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন। তিনি অল্পকালের মধ্যেই মধ্য-এশিয়ায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসাবে খ্যাত হয়ে পড়লেন। নানা রাজ্য থেকে বিদ্যার্থী ও ভিক্ষুরা কুমারজীবের সাক্ষাৎ লাভের জন্য ও তাঁর নিকট অধ্যয়ন করবার জন্য আসতে সুরু করলেন এবং তাঁর নাম পূর্ব্বদিকে চীনদেশ পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

এই সময় কুচী-দেশে অন্তঃশত্রুর আবির্ভাব হ'ল। রাজার দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়েরা ঈর্ষ্যাপরবশ হ'য়ে চীনদেশের এক

সেনাপতিকে কুচী আক্রমণ করতে আহ্বান করলেন। প্রবল চীন-সৈন্যের সঙ্গে কুচীর রাজা বেশীদিন যুদ্ধ করতে পারলেন না। কুচী বিধ্বস্ত হ'ল ও বিজয়ী চীন-সেনাপতি যুদ্ধের বন্দীদের নিয়ে দেশে ফিরে' গেলেন। এই বন্দীদের ভিতর ছিলেন কুমারজীব। বন্দী হ'লেও তিনি চীনদেশে যথোপযুক্ত সম্মান পেলেন ও অল্পকালের মধ্যেই চীনসম্রাটের রাজ-পুরোহিতের পদে নিযুক্ত হ'লেন। এই পদে নিযুক্ত হ'য়ে তিনি ভারতের ধর্ম্ম ও শাস্ত্র প্রচারেই আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর হাতে ও তাঁর তত্ত্বাবধানে বহু সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ চীন ভাষায় অনূদিত হ'ল। এই সকল অনুবাদ এখনো চীনা বৌদ্ধ সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে স্থান পেয়ে আসছে।

কুমারজীব প্রায় ত্রিশ বৎসর চীন দেশে কাটিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই ত্রিশ বৎসর ধরে' তিনি চীনদেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতদের দীক্ষাগুরু হিসাবে সম্মান পেয়েছিলেন। প্রায় হাজার বৎসর ধরে' বহু ভারতীয় পণ্ডিত চীনদেশে গিয়েছিলেন, কিন্তু কুমারজীব তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাবার উপযুক্ত। তাঁর অনূদিত ও রচিত গ্রন্থ আলোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তাঁর বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি ছিল, সংসারের মোহ তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি, রাজনৈতিক বিপ্লব তাঁর চিত্তকে বিচলিত করতে পারে নি,

দেশান্তরেও তিনি তাঁর মনের শান্তি হারিয়ে ফেলেন নি। বোধিসত্ত্বের আদর্শ নিয়েই তিনি জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করা ও সেই জ্ঞান দশের ভিতর ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। তা'রই প্রচারকল্পে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে তিনি নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। চীনদেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রচার, তাঁর মত আর কেউ করতে পারেন নি। কারণ, চীনারা তাঁর নিকট যেমন ভারতীয় শাস্ত্র পেয়েছিল, তেমনি ভারতের একজন আদর্শ পুরুষকেও চোখের সাম্‌নে দেখতে পেয়েছিল। সেই জন্যই তিনি তাদের বেশী অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন।

অগ্নিদেশ

কুচী হতে যে পথ পশ্চিম মুখে গোবি মরুভূমির এক প্রান্ত হয়ে তুন-হোয়াং পর্য্যন্ত গিয়েছে, সেই পথের উপরেই প্রাচীন 'অগ্নিদেশ' অবস্থিত ছিল। এ দেশের নাম যে অগ্নিদেশ ছিল তা' মধ্য-এশিয়ার নানা পুঁথিপত্র হতেই জানা যায়; তা ছাড়া প্রাচীন চীনা ইতিহাসে এ দেশের নাম দেওয়া হয়েছে—ইয়েং-কি বা অ-কি-নি এবং সে সব নামও যে অগ্নি কথারই রূপান্তর তাতে সন্দেহ নেই।

প্রাচীন অগ্নিদেশের রাজধানীর বর্ত্তমান নাম কারাশর।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, অগ্নিরাজ্যের অধিবাসীরা ছিল কুচীয়-জাতির জ্ঞাতিভাই, আর তাদের মাতৃভাষা ছিল সেই ভাষারই একটি পরিবর্ত্তিত রূপ, যার নামকরণ করা হয়েছে তুখারীয় (Tokharian)। এ নাম দেবার প্রধান কারণ হচ্ছে যে, প্রাচীন তুর্কী ভাষায় 'মৈত্রেয়সমিতি' নামক এক বৌদ্ধ নাটকের প্রাচীন অনুবাদ পাওয়া গিয়েছে এবং সেই অনূদিত গ্রন্থের শেষে বলা হয়েছে যে, এ গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল "তোখ্‌রি" ভাষা হতে। অপর পক্ষে, অগ্নিদেশের প্রাচীন ভাষাতেও এই নাটকের অনুবাদের এক খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। এই থেকে অনুমান করা হয়েছে যে, তুর্কী অনুবাদের মূল হচ্ছে এই অগ্নিদেশের ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ; অতএব 'তোখ্‌রি' বা 'তুখারীয়' ভাষা হচ্ছে সেই অগ্নিদেশের ভাষা। এ অনুমান এখনও প্রমাণসাপেক্ষ বলে, এবং প্রকৃত তুখার জাতি এদেশে কোন দিন বাস করত কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চয়-তার অভাবেই, অনেকে অগ্নিদেশের ভাষাকে "অগ্নিক" বলা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন।

সে যা হো'ক এই অগ্নিক ভাষা ছিল আর্য্য ভাষা এবং সে ভাষায় অনূদিত বৌদ্ধশাস্ত্রের নানা গ্রন্থের খণ্ডিতাংশ মধ্য-এশিয়ায় আবিষ্কৃত হয়েছে। কুচীকদের মত সে দেশের অধি-বাসীরাও সর্ব্বাস্তিবাদ-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল।

ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপি তারা নিয়েছিল এবং সংস্কৃত ভাষায় তাদের অধিকার ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে যখন হিউয়ান-সাং এদেশে আসেন, তখন এদেশের রাজধানীতে দশটী প্রধান বৌদ্ধবিহার ছিল এবং ভিক্ষুসংখ্যা ছিল প্রায় দু'হাজার। বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা বৌদ্ধশাস্ত্র অতি গভীর ভাবে আলোচনা করতেন এবং সে শাস্ত্রে তাঁদের সত্যকার অধিকার ছিল।

অগ্নিরাজ্য কোন দিনই কুচীর মত শক্তিশালী হতে পারে নাই, এবং স্বাধীনতাও রক্ষা করতে পারে নাই। এ রাজ্য নানা যুগে চীন সাম্রাজ্যের অধীন ছিল এবং সেই কারণে এ দেশের প্রাচীন সভ্যতায় চীনাদের সম্পূর্ণ প্রভাব ধরা পড়ে। কারাশর ও কারাশর হতে আরও পশ্চিমে তুর্ফাণ নামক স্থান হতে প্রাচীন অগ্নিক সভ্যতার যে সব নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে তা' হতে চীনা প্রভাব সম্পূর্ণ ভাবে ধরা পড়ে। কিন্তু, এ চীনা প্রভাব সত্ত্বেও এ দেশের প্রাচীন চিত্রকলা বা ভাস্কর্য্য মধ্য-এশিয়ার ধারা বজায় রেখেছে। তার মধ্যেও আমরা পাই ভারতীয় চিত্রকরের প্রেরণা; রচনা-রীতিতে পারসিক, গ্রীসীয় ও রোমক এবং সর্ব্বোপরি চীনা প্রভাব।

অগ্নিদেশের প্রান্তভূমি হতে মরুভূমির আরম্ভ; এ মরুভূমি

হচ্ছে গোবির অংশবিশেষ। এ মরুভূমি অতিক্রম করলেই চীন সাম্রাজ্যের প্রবেশদ্বার ইউ-মেন্ গিরিবর্ত্মে পৌঁছা যায়। প্রাচীন কালে নানা দেশ হতে যে সব বৌদ্ধ ভিক্ষু কুচী ও অগ্নিদেশের পথে চীন যাত্রা করতেন, তাঁরা এই মরুভূমি অতিক্রম করে ইউ-মেন গিরিবর্ত্মের নিকটবর্ত্তী তুন্-হোয়াং-এর প্রাচীন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানে কিছুকাল অতিবাহিত করতেন। পূর্ব্বেই বলেছি যে, মধ্য-এশিয়ার দক্ষিণবাহী পথও এই তুন্-হোয়াং-এ মিলিত হয়েছে। সুতরাং, কাশগর খোটান প্রভৃতি দেশ হতে যে সব বৌদ্ধ ভিক্ষু চীন যাত্রা করতেন তাঁরাও এই তুন-হোয়াং-এ এসে পৌঁছুতেন ও তাঁদের পথশ্রান্তি লাঘব করতেন।

তুন্-হোয়াং-এর হাজার বুদ্ধ

তুন্-হোয়াং এই নানা পথের সন্ধিস্থলে অবস্থিত বলে বিভিন্ন দেশের বণিক্ ও ধর্ম্মযাজক এ-স্থানে নানা সভ্যতার ধারা বয়ে এনেছিল। চীন দেশের সীমান্তে এই ছিল একমাত্র স্থান যেখানে তারা তাদের সুদূর পথের শ্রান্তি দূরীভূত করতে পারত। এই কারণে অতি প্রাচীনকাল হতেই তুন্-হোয়াং একটি বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী হয়ে উঠেছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে এখানে বৌদ্ধবিহারও স্থাপিত হয়েছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয়-

তৃতীয় শতকে যে সব বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনদেশে গিয়েছিলেন, তাঁদের জীবনী হতে দেখতে পাই যে, তাঁরা অনেকে ভারতবর্ষ, শকদেশ, খোটান প্রভৃতি স্থান হতে বৌদ্ধশাস্ত্রের পুঁথি-পত্র বয়ে নিয়ে এসে প্রথমে তুন্‌-হোয়াং-এ অবস্থান করেছিলেন, এবং চীনা ও অন্যান্য পণ্ডিতদের সহায়তায় এই স্থানে বসে অনেক গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশের অনেক পরিবার তুন্‌-হোয়াং পর্য্যন্ত আসতেন ও সেখানে বসবাস করতেন। এ সব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন কয়েকজন বৌদ্ধপণ্ডিতের নাম আমরা চীনা সাহিত্য হতে পাই। এঁদের মধ্যে ধর্ম্মরক্ষের নাম উল্লেখযোগ্য। ধর্ম্মরক্ষ ছিলেন খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষ ভাগের লোক। তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তুন্‌-হোয়াংএ এক কুশাণ পরিবারে। সেই কারণে ভারতীয় ভিক্ষু হিসাবেই তিনি তাঁর পরিচয় দিতেন। তিনি অল্প বয়স হতেই ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেন ও বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন সুরু করেন। তিনি ভারতীয় ছিলেন বলে সংস্কৃত শিক্ষা করা তাঁর পক্ষে ছিল সহজসাধ্য। অপর পক্ষে তুন্‌-হোয়াং ছিল মূলতঃ একটী চীনা পল্লী, সেই জন্য অতি অল্প বয়স হতেই চীনা ভাষায় তাঁর হাতে খড়ি হয়। প্রথমে তুন্‌-হোয়াং-এর বৌদ্ধপণ্ডিতদের নিকটই তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন; পরে মধ্য-এশিয়ার

নানাস্থান হতে চীনযাত্রী যে সব বৌদ্ধ পণ্ডিত তুন্‌-হোয়াং-এ আসতেন তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে সে শাস্ত্রে তাঁর অধিকার গভীরতর হয়। ২৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি তুন্‌-হোয়াং ছেড়ে চীনসাম্রাজ্যের রাজধানীতে যান এবং ২১১ খানি বৌদ্ধ গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। এ সব অনূদিত গ্রন্থের অনেকগুলি এখনো পাওয়া যায়।

তুন্‌-হোয়াং পল্লীর একান্তে একটা ছোট নদীর ধারে অনুচ্চ পর্ব্বতমালা; এই পর্ব্বতের নানা গুহা বহুদিন ধরে তুন্‌-হোয়াং-এর প্রবাসী বৌদ্ধ সাধকদের আকৃষ্ট করেছিল। নিভৃতে সাধনা করবার এরূপ প্রকৃষ্ট স্থান আর সে প্রদেশে ছিল না। এই গুহাগুলি ক্রমশঃ বৌদ্ধ মন্দিরে পরিণত হতে লাগল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষভাগে যখন চীন-সাম্রাজ্য বৈদেশিক তুর্কী রাজাদের হস্তগত হল এবং সে রাজারা যখন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁদের উৎসাহ ও সাহায্য পেয়ে চীনদেশের নানাস্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার-কার্য্য চলল এবং সেই সঙ্গে নূতন নূতন বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগল।

ঠিক এই সময়েই তুন্‌-হোয়াং-এর গিরিগুহাগুলিকে একটি বিরাট বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার চেষ্টা আরম্ভ হল। প্রতি গুহা চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে সুশোভিত হল এবং সর্ব্বসমেত এক হাজার বৌদ্ধ-মূর্ত্তি নির্ম্মিত হল। মধ্য-এশিয়া ও চীন হতে

বহু ভিক্ষু এখানে বৌদ্ধশাস্ত্রের পুঁথিপত্র নিয়ে এলেন এবং তুন্-হোয়াং-এর এই গুহামন্দিরগুলি হয়ে উঠল বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনার একটী প্রধান কেন্দ্র।

খৃষ্টীয় একাদশ শতকে আরব অভিযানের ফলে মধ্য-এশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা সহসা অন্যরূপ ধারণ করল। নানাস্থানের বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠান ধূলিসাৎ হল এবং বৌদ্ধধর্ম্ম তখন হল লুপ্তপ্রায়। এই বৈদেশিক অভিযানের প্রাক্কালে তুন্-হোয়াং-এর বৌদ্ধভিক্ষুরা প্রাচীন পুঁথিপত্র রক্ষা করবার জন্য সেগুলিকে একটি গুহায় নিক্ষেপ করে তার মুখ বন্ধ করে চীনদেশে পলায়ন করলেন।

প্রায় হাজার বছর পরে সে প্রতিষ্ঠান যখন নূতন করে আবিষ্কার করা হল, তখন দেখা গেল যে সমস্ত পুঁথিপত্র রয়েছে অক্ষত। পুঁথির সংখ্যা বিশ হাজারের উপর, এবং সে সব পুঁথি এখন আংশিক পারিসের ও আংশিক পেকিনের সরকারী পুস্তকালয়ে সংরক্ষিত হয়েছে। এসব পুঁথির মধ্যে বৌদ্ধশাস্ত্রই বেশী, আর বৌদ্ধশাস্ত্রের পুঁথিগুলি নানাভাষায় ও নানা লিপিতে লিখিত। এর মধ্যে প্রথমতঃ চীনা ভাষায় অনূদিত বৌদ্ধ গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে। এ সব অনুবাদ চীনদেশ হতে প্রায় লোপ পেয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, খুব প্রাচীন (কুশাণ ও গুপ্তযুগের) ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত সংস্কৃত পুঁথি এবং সুগ্দীয়,

কুচীয়, তিব্বতী, তুর্কী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত বৌদ্ধশাস্ত্রের পুঁথিও তুন্‌-হোয়াংএর পুস্তকালয়ে ছিল। বৌদ্ধশাস্ত্র ছাড়া, মধ্য-এশিয়ায় প্রচলিত মানিকীয় ধর্ম্মের পুঁথিও এই সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে। মানিকীয় ধর্ম্ম পারস্যে উদ্ভূত হলেও, সে ধর্ম্ম ছিল স্বদেশ হতে বিতাড়িত; মধ্য-এশিয়ার নানাস্থানেই শুধু তার প্রচলন ছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে সে ধর্ম্ম কালক্রমে যে রূপ গ্রহণ করেছিল, তা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অগ্রাহ্য ছিল না। সেই কারণেই বৌদ্ধশাস্ত্রের সঙ্গে এ ধর্ম্মের নানা গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে।

আর্টের ইতিহাসে তুন্‌-হোয়াংএর গুহামন্দিরের স্থান অতুলনীয়। বহু বিভিন্ন ধারার সম্মিলনে যে কি চিত্তাকর্ষক চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের সৃষ্টি হতে পারে তার প্রমাণ তুন্‌-হোয়াংএর গিরিগুহা এখনো বহন করছে। নানা গুহায় প্রাচীর-চিত্রে ভারতীয়, পারসিক প্রভৃতি প্রভাবের সমন্বয় ধরা পড়ে, অথচ সে সব চিত্র প্রথমেই যে অজন্তার কথা মনে করিয়ে দেয় তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। নানা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তির বিচার করলে তার মধ্যে নানা রচনাশৈলীর নিদর্শন পাওয়া যায়—(১) গুপ্তযুগের ভারতীয় ভাস্কর্য্য, (২) ইন্দোগ্রীক ভাস্কর্য্য, (৩) চীনা ভাস্কর্য্য, (৪) ইন্দো-শক ভাস্কর্য্য।—এই শেষোক্ত রীতি হয় ত কোন দিনই সুপ্রতিষ্ঠিত

হতে পারে নি ; তবে ভারতবর্ষে মথুরা অঞ্চলে, ও মধ্য-এশিয়ার নানাস্থানে এই রচনারীতিতে নির্ম্মিত মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছে। এ সব মূর্ত্তির বিশেষত্ব হচ্ছে—নূতন রকমের বর্ম্ম ও লম্বা বুট, যা শক রাজারা ব্যবহার করতেন। শিল্পের এই বিভিন্ন ধারা মিলিত হয়ে যে নূতন শিল্পের সৃষ্টি করেছিল সে শিল্প চীন ও জাপান সাদরে গ্রহণ করেছিল।

এ পর্য্যন্ত সংক্ষেপে যা বলেছি তা হতে বেশ বোঝা যাবে যে, ভারতীয় সভ্যতা মধ্য-এশিয়াকে হাজার বছর ধরে কি ভাবে আলোড়িত করেছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের দিকে মধ্য-এশিয়ায় নানা জাতি ইতস্ততঃ বিচরণ করছিল; কোথাও স্থায়ী ভাবে বসবাস করবার মত তাদের শিক্ষা বা দীক্ষা কিছুই ছিল না। ভারতবর্ষের সঙ্গে সে সব জাতির যোগাযোগ হতেই তাদের মধ্যে নূতন প্রাণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। যাদের ভাষার বাহন লিপি ছিল না, ভারতবর্ষ হতে তারা লিপি পেল ; যাদের সাহিত্য ছিল না তারা সাহিত্য পেল ; যাদের মন পূর্ব্বে কখনো ধর্ম্মের স্পর্শ পায় নি, তারা বৌদ্ধধর্ম্মকে নিজস্ব করে নিল এবং সেই ধর্ম্মকে অবলম্বন করে নিজেদের দেশকে শিক্ষা ও ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে সুশোভিত করে তুলল। এ কার্য্যে তারা প্রেরণা পেল ভারতীয় ভিক্ষু ও শিল্পী উভয়ের।

হাজার বছর পরে যখন বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণে সে দেশ বিধ্বস্ত হল, নানা প্রাচীন জাতির মধ্যে কেহ বা সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট হল, এবং কেহ বা স্বদেশ পরিত্যাগ করল, তখন হতেই প্রাচীন মধ্য-এশিয়ার রূপ পরিবর্ত্তিত হল। মধ্য-এশিয়ার খোটান, কুচী, অগ্নি প্রভৃতি যে সব প্রদেশ পূর্ব্বে রোমক, গ্রীক, চীনা, পারসিক, ভারতীয় ইত্যাদি জাতিকে আকৃষ্ট করেছিল, যে সব প্রদেশের নানা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে বৌদ্ধভিক্ষু ও বিদেশী ধর্ম্মযাজক শাস্ত্রালোচনায় কালাতিপাত করতে আনন্দ অনুভব করতেন, সে সব প্রদেশ বহির্জগতের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে পড়ল। বর্ত্তমান যুগে মধ্য-এশিয়া বৈদেশিক পণ্ডিতদের পুনরায় আকৃষ্ট করল বটে, কিন্তু সে আকর্ষণের বস্তু হল মরুভূমির বালুকাস্তরের মধ্যে লুক্কায়িত প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন।

মধ্য-এশিয়ার এ ইতিবৃত্ত ভারতের ইতিহাসের একটী গরিমাময় অধ্যায়, যা ভারতকে হয় ত পুনরায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য প্রভৃতির যে সব ধারা লুপ্ত হয়ে গেছে, মধ্য-এশিয়ার মরুভূমির একান্তে সে সব ধারা পুনরুদ্ধার করা হয় ত আবার সম্ভবপর হবে।

পরিশিষ্ট

মধ্য-এশিয়ায় প্রাচীন সভ্যতার অনুসন্ধান

বিগত শতকের শেষভাগে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। সেই সময় থেকে তাঁরা দলে দলে সেই সব ধ্বংসস্তূপের অন্তরালে প্রাচীন সভ্যতার যে নিদর্শন রয়েছে তার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন, আর তাঁদের সে অনুসন্ধান আজও শেষ হয় নাই। কিন্তু এরই মধ্যে যে সব রত্ন তাঁরা উদ্ধার করতে পেরেছেন তার থেকে এশিয়াখণ্ডের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের অনেক লুপ্ত ধারার খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। সে সব ধারার যোগসূত্রগুলির সম্পূর্ণ উদ্ধার সাধন করতে না পারলে ভারতবর্ষ, চীন, পারস্য প্রভৃতি দেশের প্রাচীন কীর্ত্তির নিখুঁত ছবি আঁকা কোন দিনই সম্ভবপর হবে না তা' ঐতিহাসিকেরা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছেন।

(১)

মধ্য-এশিয়ায় যে বহু প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ রয়েছে সে সংবাদ ইউরোপে নিয়ে যান প্রথম রুশীয় পণ্ডিতগণ। ১৮৭৯ সালে উদ্ভিদ্‌বিদ্ Dr. A. Regel তাঁর নিজের কার্য্যোপলক্ষে তুর্ফান

পর্য্যন্ত আসেন ও তুর্ফানের সমস্ত প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্বন্ধে ইউরোপে প্রথম সংবাদ দেন। সেই সংবাদে প্রলুব্ধ হয়ে ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে দুই জন রুশীয় পণ্ডিত G. Grum Grzhimaylo ও M. Grum Grzhimaylo, ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে ফিনল্যাণ্ড থেকে Donner ও Baron Munk এবং ঐ বৎসরেই রুশীয় পণ্ডিত Dr. Klementz পর পর মধ্য-এশিয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান নিয়ে আসেন ও মধ্য-এশিয়ার উত্তর সীমান্তে Idikutshahri, Qocho, Karakhoja, Turfan, Toyuq, Murtuk প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন অনুসন্ধান করেন। Dr. Klementzএর অনুসন্ধানের ফলে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে মধ্য-এশিয়ায় এক সময়ে যে বিভিন্ন সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল তার নিদর্শন কোথাও ধ্বংসস্তূপের নীচে, কোথাও বা মরুভূমির বালুকার অন্তরালে নিহিত রয়েছে। সুতরাং সে সব স্তূপ খনন না করতে পারলে প্রাচীন নিদর্শনগুলি উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

এই রুশীয় অভিযানের কিছু পূর্ব্বে ১৮৯০ খৃঃ অব্দে Col. Bower মধ্য-এশিয়ার উত্তর সীমান্তে কুচী (Kuchi) নামক স্থানে কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেন। স্থানীয় তুর্কীরা এই পুঁথিগুলি একটী বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষের ভিতর খুঁজে পেয়েছিল। Col. Bower পুঁথিগুলি Asiatic Society

of Bengalএ পাঠিয়ে দেন ও Dr. Hoernle সেগুলির সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। পুঁথিগুলি প্রাচীন গুপ্তাক্ষরে লিখিত আর সেগুলি হচ্ছে ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদের পুঁথি। পুঁথির ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত ও তার কুচীয় (Kuchiর প্রাচীন ভাষা) অনুবাদ।

১৮৯২ খৃঃ অব্দে ফরাসী পর্য্যটক Dutreuil de Rhins খোটানের নিকটবর্ত্তী কোমারি-মজর (Komari Mazar) নামক স্থানে আর একখানি খণ্ডিত পুঁথি সংগ্রহ করেন। কয়েক বৎসর পরে ফরাসী পণ্ডিত Emile Sénart এই পুঁথির পাঠোদ্ধার করে প্রকাশ করেন। এ পুঁথি হচ্ছে, খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত বৌদ্ধ 'ধম্মপদে'র পুঁথি। আমরা এর পূর্ব্বে শুধু পালি ভাষায় লিখিত ধর্ম্মপদের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। কিন্তু এই নূতন ধর্ম্মপদ যে ভাষায় লিখিত সে ভাষা হচ্ছে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের একটী প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা। ধর্ম্মপদের এই খরোষ্ঠী পুঁথির আর একটী খণ্ডিতাংশ রুশীয় পণ্ডিতদের সংগ্রহে পাওয়া যায় ও পেট্রোগ্রাদ (বর্ত্তমানে লেনিনগ্রাদ) হ'তে প্রকাশিত হয়।

এই সব প্রাচীন পুঁথির খোঁজ পেতেই ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মধ্য-এশিয়ায় রীতিমত প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালাবার আবশ্যকতা বুঝতে পারলেন ও সেই উদ্দেশ্যে ১৯০০ সালে

Dr. Stein (বর্ত্তমানে Sir Aurel Stein) ভারত সরকারের সাহায্যে কাশ্মীর হতে মধ্য-এশিয়ায় তুর্কীস্থান অভিমুখে রওনা হলেন। Dr. Stein এই সময়ে কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই তিনি ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পথঘাট সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। প্রায় এক বৎসর ধরে তিনি খোটান (Khotan) ও তার নিকটবর্ত্তী নানা স্থানে অনুসন্ধান করে ও নানা স্তূপের ধ্বংসাবশেষ ও বালুকা খনন করে প্রাচীন কালের বহু নিদর্শন সংগ্রহ করলেন। খোটান প্রদেশে এই অভিযানের ফল তিনি প্রকাশ করেন দুখানি বিরাট গ্রন্থে—Ancient Khotan Vols I., II. (1907) ও The Sand-buried Ruins of Khotan.

ঠিক এই সময়েই সুইডেন থেকে Sven Hedin মধ্য-এশিয়ার পূর্ব্ব সীমান্তে 'লব-নো'র হ্রদের নিকটে একটী প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান করে বের করেন ও নানা প্রাচীন পুঁথিপত্র সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন।

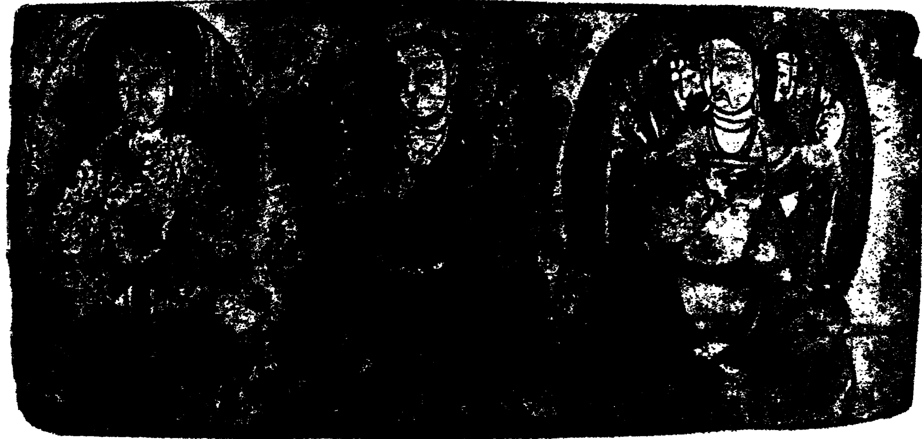
ষ্টাইন সাহেবের প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের সাফল্যে ইউ-রোপে নানা স্থানে উৎসাহের সঞ্চার হয় ও ১৯০২ সালে জার্ম্মানীর Voelkerkunde মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষগণ (Koenigliche Museum fuer Voelkerkunde)



পাহাড়ের ধারে প্রাচীন বৌদ্ধ গুহামন্দিরের ধ্বংসাবশেষ (হামি) । (পৃঃ ৮৪



তুমচুক ঃ খননাবিষ্কৃত প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ (পৃঃ ৬৪)



দান্দান্ উইলিক : প্রাচীর-গাত্রে অঙ্কিত মূর্তি (পৃঃ ৫৬)

অধ্যাপক Gruenwedelকে মধ্য-এশিয়ায় প্রেরণ করেন। অধ্যাপক Gruenwedel মধ্য-এশিয়ার উত্তর সীমান্তে তুর্ফান (Turfan) প্রদেশেই বিশেষভাবে অনুসন্ধান করেন ও নিকটবর্ত্তী আরও তুই একটী প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ পরীক্ষা করে ১৯০৩ সালে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অধ্যাপক Gruenwedel-এর অভিযান ছিল বে-সরকারী। ১৯০৪ সালে জর্ম্মান সরকারের সহায়তায় Dr. A. von Le Coq মধ্য-এশিয়ায় যান ও তুর্ফান ও তার নিকটবর্ত্তী নানা স্থানে অনেক প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করেন। ঐ বৎসরে Gruenwedelকে দ্বিতীয় বার মধ্য-এশিয়ায় পাঠান হয় ও তিনি কুচী, কারাশ'র, তুর্ফান, মিং-উই, কিজিল, বাজাকৃলিক্ প্রভৃতি স্থানে ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত গভীর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন। এই অনুসন্ধানের ফলে—চীনা, সংস্কৃত, সিরিয়াক্, সগ্‌দিয়ান, পারসিক প্রভৃতি ভাষায় লিখিত বহু প্রাচীন পুঁথি ও প্রাচীন ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার নিদর্শন সংগৃহীত হয়। এই সব পুঁথিপত্রে এমন তু'টী প্রাচীন ভাষার প্রথম খোঁজ পাওয়া যায়—যার অস্তিত্ব পূর্ব্বে জানা ছিল না। এ তু'টী ভাষাকে বলা হয়—Tokharian তুখার ভাষা ও প্রাচীন খোটানী ভাষা—Noth-Aryan।

১৯০৬ সালে ভারত সরকার ষ্টাইন সাহেবকে দ্বিতীয় বার মধ্য-এশিয়ায় প্রেরণ করেন। ষ্টাইন এবারে খোটান হ'তে

সুরু করে তাক্‌লা-মাকন মরুর মধ্য দিয়ে চীন দেশের পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত নানা স্থানে অনুসন্ধান চালান ও অনেক প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ খনন করে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন উদ্ধার করেন। এবারে তাঁর সব চাইতে প্রধান আবিষ্কার হল চীন দেশের সীমান্তে তুন্‌-হোয়াং (Tun-hwang) নামক স্থানে। তুন্‌-হোয়াংএর পর্ব্বতমালায় তিনি প্রায় ৫০০ গুহা আবিষ্কার করলেন। এগুলি ছিল সেকালে বৌদ্ধদের গুহামন্দির—চীনা ভাষায় "চিয়েন্‌-ফো-তোং" অর্থাৎ Caves of Thousand Buddhas (সহস্র-বুদ্ধের গুহা) নামে পরিচিত ছিল। আর এই সব গুহায় তিনি আবিষ্কার করলেন প্রাচীন চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন ও অনেক পুঁথিপত্র। এ ছাড়া খোটানের নিকটবর্ত্তী দোমোকো (Domoko), নিয়া, লু্য-লান্‌, মিরান প্রভৃতি স্থানেও অনেক নূতন নিদর্শন সংগ্রহ করে তিনি ১৯০৮ সালে দেশে ফেরেন।

ফ্রান্সে ঠিক এই সময়ে Comité Francais de l'Association Internationale pour l'exploration de l'Asie centrale নামক অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয় ও এই সমিতির সহায়তার ১৯০৬ সালে ফরাসী অধ্যাপক পল পেলিও (Paul Pelliot) মধ্য-এশিয়ায় রওনা হন। তিনি মস্কো থেকে তাস্কেন্দের পথে কাশগর (Kashgar) পৌঁছে

অনুসন্ধান সুরু করেন। কাশগর হ'তে উত্তর সীমান্ত দিয়ে তিনি তুমচুক্, কুচার, কিজিল প্রভৃতি স্থানে ধ্বংস-স্তূপ খনন করে নানা প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করে অবশেষে ১৯০৮ সালে তুন্-হোয়াংএর Caves of Thousand Buddhasএ এসে পৌঁছান। এই গুহাশ্রেণীতে ষ্টাইন সাহেব যে সব জিনিষ অনুসন্ধান করে পান-নি অধ্যাপক পেলিও তার উদ্ধার সাধন করলেন। ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার নিদর্শন ছাড়া প্রায় ১৫ হাজার পুঁথিপত্র—আর এ সব পুঁথি-পত্রের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে—খুব প্রাচীন আর এশিয়ার নানা ভাষায় লিখিত—সংস্কৃত, চীনা, তিব্বতী, তুর্কী, সুগ্দীয় (Soghdian), কুচীয় (Kuchean) ইত্যাদি। পেলিওর নিজের কথাগুলি অনুবাদ করে দিলে তাঁর এ আবিষ্কারের মূল্য ঠিক বোঝা যাবে—

"Of the 15000 rolls which thus passed through my hand I took all that had by their date and contents struck me as of primary interest—about one third of the whole. Amongst these I put in texts iu Brahmi writing and Uigur, many Tibetan but mostly Chinese. There was for the Sinologist some invaluable treasure. Many of these were on Buddhism without doubt but some

also were on history, geography, plilosophy. classics, literature proper and again deeds of all sorts, accounts, notes taken from day to day and all were anterior to the 11th Century."

১৯০৬-৭ ও ১৯০৮ সালে রুশ সরকারের পক্ষ থেকে Berisovsky ও Kazaloff যথাক্রমে মধ্য-এশিয়ায় আসেন। Kazaloff প্রাচীন কারা-খোতা (Kara-Khota) নগরের ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কার করেন ও তাঙ্গুত (Tangut) ও চীনা ভাষায় লিখিত বহু পুঁথিপত্র সংগ্রহ করেন। Kazaloffএর সংগৃহীত পুঁথিপত্র অধ্যাপক Serge d'Oldenburg কর্ত্তৃক আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়।

ইউরোপের নানা দেশের পক্ষ থেকে যখন এই প্রচেষ্টা চল্‌ছিল প্রাচ্যজাতিরাও যে তখন নিশ্চেষ্ট ছিল তা নয়। ১৯০৪ সালে জাপানের পক্ষ থেকে কাউণ্ট ওতানি (Count Otani) রুশীয় তুর্কীস্থান, খোটান, কাশগর, কুচা ও তুর্ফান অঞ্চলে অনুসন্ধান চালান ও প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের নানা নিদর্শন, এবং নানা ভাষায় লিখিত প্রাচীন পুঁথিপত্র ও প্রাচীন ভাস্কর্য্যের নিদর্শন প্রভৃতি সংগ্রহ করে দেশে ফেরেন। এর কয়েক বৎসর জাপান থেকে আর এক অভিযান অধ্যাপক তাচিবানার (Tachibana) নেতৃত্বে

মধ্য-এশিয়ায় প্রেরিত হয়। তাচিবানা মঙ্গোলিয়া, থিয়েন্-শান্ পর্ব্বতের অন্তঃপাতি নানা প্রাচীন স্থান, তুর্ফান, কুচা, লব্-নোর ও খোটান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন সংগ্রহ করেন। তাঁর এই অভিযানের ফলাফল জাপানে জাপানী ভাষায় প্রকাশিত হয়।

[২]

১৮৯০ খৃঃ অব্দে Col. Bower ও Dutreuil de Rhins কর্ত্তৃক সংগৃহীত পুঁথিগুলি ইউরোপের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যে অভূতপূর্ব্ব কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল তারই ফলে ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত যে সব অনুসন্ধান চললো ও প্রাচীন সভ্যতার যে সব নিদর্শন ইউরোপে নিয়ে আসা হ'ল তার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া ও পুঁথিপত্রের পাঠোদ্ধার করা সুরু হল ১৯১০ সালের পরে। কিন্তু এই সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার অনুসন্ধানের কাজও চলতে থাক্‌লো।

এই অনুসন্ধানের ফলাফল যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে তাতে ঐতিহাসিকের জ্ঞানের সীমা প্রসারতা লাভ করেছে কিন্তু মধ্য-এশিয়ার অনুসন্ধানের কাজ যে শেষ হয়েছে এমন কথা বলা চলে না। যাঁরা বহুদিন ধরে এই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন তাঁদের উৎসুক দৃষ্টি এখনো ঐ মধ্য-এশিয়ার মরুভূমির

উপর নিবদ্ধ। তাই ষ্টাইন সাহেব কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর এই অনুসন্ধানের কার্য্যে বাধা পেয়ে দুঃখিত হয়ে বলেছেন—"This duty to research, together with the sad realities of present Eastern politics which bar access for me to my life-long goal across the Indian North-west Frontier, has denied me since 1916 the eagerly desired chance of another Central Asian expedition." কিন্তু এসব বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও অনুসন্ধানের কার্য্য বরাবরই চলেছে।

ষ্টাইন সাহেব ১৯১৩ সালে তৃতীয় বার মধ্য-এশিয়ায় রওনা হ'ন। এবার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে যে-সব প্রাচীন স্থানে পূর্ব্বে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান চালাতে পারেন নি সে সব স্থানে পুনরায় অনুসন্ধান করা। এইবার তিনি চীনের সীমান্ত প্রদেশ Kan-shu পর্য্যন্ত অভিযান নিয়ে যান, পথে খোটান, নিয়া, তুন্‌-হোয়াং প্রভৃতি স্থানে পুনরায় প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের অনুসন্ধান করেন। Kan-shu থেকে মরুভূমি অতিক্রম করে তিনি উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে Borkul Guchen ও Jimasa পরিদর্শন করেন ও ফিরবার পথে Idikutshahri, Leu-lan, Kucha, Aksu ও অন্যান্য প্রদেশে প্রাচীন স্থানগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেন।

১৯১৫ সালে তিনি কাশগর পরিত্যাগ করে Oxus নদীর উত্তর দিকে পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যেও তাঁর অনুসন্ধান চালান ও সমরকন্দ, খোরাশান ও সিস্তান (বেলুচিস্তান ও পারস্যের অংশ-বিশেষ) হয়ে ১৯১৬ সালে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। সিস্তানে অনুসন্ধানের ফলে তিনি যে সব তথ্য সংগ্রহ করেন তা'তে তাঁর মনে হয় যে এ প্রদেশ ছিল সেকালে "An outpost of Iran and the Hellenistic Near-East towards Buddhist India."

১৯১৪ সালে চতুর্থ রুশীয় অভিযান মধ্য-এশিয়ায় এবং বিশেষতঃ তুন-হোয়াং অঞ্চলে পাঠানো হয়—কিন্তু এ অভিযানের কোন বিস্তৃত সংবাদ বাইরে প্রকাশিত হয় নি।

১৯২৩-২৪ সালে অধ্যাপক ফুশে (Foucher) আফগানিস্তানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হাইবাক (Haibak) নামক স্থানে খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকের প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কার সম্বন্ধে অধ্যাপক ফুশের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ Jorunal Asiatiqueএ প্রকাশিত হয়েছে।

১৯২৯-৩০ সালে ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক আকাঁ (Hackin) আফগানিস্তানে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের বামিয়ান (Bamiyan) উপত্যকায় অনুসন্ধান চালান। এই উপত্যকায় প্রাচীনকালে

একটী প্রসিদ্ধ নগর অবস্থিত ছিল, আর সেই নগরের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতমালায় বহু বৌদ্ধ গুহা-বন্দির নির্ম্মিত হয়েছিল। এই সব-গুহা-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনুসন্ধান করে আকাঁ প্রাচীন প্রাচীর চিত্র, ভাস্কর্য্যের নিদর্শন ও খণ্ডিত পুঁথিপত্র সংগ্রহ করেন। চিত্র ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন এক খানি বিরাট গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৩১ সালে Misson Haardt-Citroen চীনের সীমান্ত হ'তে সুরু করে সমস্ত মধ্য-এশিয়া অতিক্রম করে। এই অভিযানের সঙ্গেও আকাঁ সাহেব ছিলেন। এই অভিযানের নেতারা এখনো কোন বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন নি, শুধু কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গিলগিট নামক স্থানে তাঁরা একটী বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন পুঁথির খণ্ডিতাংশ বের করেন। এই খণ্ডিত পুঁথি ও আকাঁ সাহেবের বামিয়ান অঞ্চলে সংগৃহীত পুঁথি অধ্যাপক লেভির সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়েছে (Journal Asiatique, 1932).

এ পুঁথিগুলি হচ্ছে বৌদ্ধশাস্ত্রের আর তাদের লিপি বিচার করলে বোঝা যায় কতকগুলি পুঁথি খুব প্রাচীন—খৃষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকের কুশাণলিপিতে লিখিত, অন্যগুলি পরবর্ত্তী কালের গুপ্তাক্ষরে লিখিত। এ সব পুঁথির মধ্যে মধ্য-এশিয়ার

নানা স্থানে—কুচা, খোটান প্রভৃতি অঞ্চলে লিখিত পুঁথির খণ্ডিতাংশও পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে মনে হয় যে বামিয়ানে সেকালে একদিকে ভারতবর্ষ হ'তে ও অন্যদিকে মধ্য-এশিয়ার নানাস্থান হ'তে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আসতেন।

যে সময়ে Mission Haardt-Citroen মধ্য-এশিয়ায় অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল সেই সময়ে ষ্টাইন সাহেব মধ্য-এশিয়ায় তাঁর চতুর্থ অভিযান নিয়ে যান। তাঁর এ অনুসন্ধানের ফলাফল এখনো প্রকাশিত হয় নি।

এই সময়ে মধ্য-এশিয়ার নানাস্থানে প্রাগৈতিহাসিক (Pre-historic) যুগের যে সব নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে তার উল্লেখ না করলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শনের প্রথম খোঁজ পান Anderson সাহেব। তিনি ছিলেন চীন-সরকারে Ministry of Agriculture & Commerceএর Mining Adviser—১৯১৮ সালে তিনি উত্তর-চীনে Chowkoutien নামক স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নানা নিদর্শন সংগ্রহ করেন। সেই সূত্র অবলম্বন করে ১৯২১ সাল থেকে সুরু করে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত নানা চীনা ও বৈদেশিক পণ্ডিত উত্তর-চীন, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও মধ্য-এশিয়ার বহুস্থানে অনুসন্ধান করে ঐ যুগের অনেক নিদর্শন পেয়েছেন। উত্তর-চীনে যে প্রাগৈতিহাসিক

যুগের এক নূতন ধরণের মানুষের অস্তিত্ব ছিল তা তাঁরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন ও সে মানুষের নাম দিয়েছেন Sinanthropos. এই সবপ্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন যে সব যুগের ও যে সব স্থানের—তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হচ্ছে—

I. Lower pliocene—Manchuria, Mongolia (Kalgan, Dalai Nor).

II. Middle pliocene—Manchuria, Mongolia (Dalai Nor)

III. Late pliocene—Manchuria, Sin Kiang ও Tarim basin, Turfan, Kucha, (মধ্য-এশিয়া) Kurlo ইত্যাদি।

IV. Early pleistocene—Manchuria.

V. Upper pleistocene—Modern.

এই সব নিদর্শনের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৩ সালে—Fossil Man in China—Davidson Black and others (Geological Memoirs, Series A, No. 11 Peiping 1933) আর এই বইয়ের শেষভাগে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ ও প্রবন্ধের একটী বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ সূচী দেওয়া হয়েছে।

[৩]

মধ্য-এশিয়ার নানা স্থানে সংগৃহীত পুঁথি-পত্র, শিলা-লেখ, কীলক-লেখ এবং ভাস্কর্য্য ও চিত্রের নিদর্শনের যতটুকু

পাঠোদ্ধার হয়েছে তার থেকে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের অনেক নূতন উপাদান পাওয়া গিয়েছে।

প্রথমতঃ এই সব পুঁথিপত্রে অনেক অধুনালুপ্ত ভাষার খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। মধ্য-এশিয়ায় এই নূতন আবিষ্কার হ'বার পূর্ব্বে আমরা প্রাচীন সুগ্দীয় (Soghdian), খোটানী (Khotanese), তুখার (Tokharian), কুচীয় (Kuchean), তুর্কী (Turkish), তিব্বতী (Tibetan) প্রভৃতি ভাষার কোনই পরিচয় পাই নি। তুখার ও কুচীয় ভাষার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আমরা সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ ছিলাম। এ দুটী ভাষার যে রূপের পরিচয় আমরা পাই তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এ-দুটী ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর একটী সম্পূর্ণ নূতন শাখা—ইরাণীয় বা সংস্কৃতভাষার থেকে উদ্ভূত নয়। পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে এ দু'টী ভাষার মধ্যে অনেক সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করেছিল মাত্র। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার এ নূতন শাখার যোগ বরং গ্রীক লাতিন প্রভৃতি শাখার সঙ্গে বেশী নিকট। তুখার-কুচীয়ভাষায় সংস্কৃত 'শতম্' শব্দের পরিবর্ত্তে কান্ত্ 'কান্তে' পাই—লাতিনে কেন্তুম্, গ্রীকে 'এ-কাতোন্,' গ্যালিক্ কান্ত্। সুগ্দীয় ভাষা—ইরাণীয় ভাষার একটী শাখাবিশেষ। মধ্য-এশিয়ার নানা পুথিপত্র থেকে এ ভাষার প্রাচীন রূপের প্রথম পরিচয়

পাওয়া গিয়েছে ও ভাষাতত্ত্বে তার স্থান ও তার ব্যাকরণ উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছে। প্রাচীন খোটানীও ইরাণীয় ভাষার একটী শাখা। প্রাচীন তুর্কী ও তিব্বতীর পরিচয় মধ্য-এশিয়ার পুথি-পত্র থেকে প্রথম পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় প্রথম শতক হ'তে একাদশ শতক পর্য্যন্ত মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল। কুচা, তুখার, তুর্ফান, করাশর, খোটান, কাশগর প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের অনেক বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল ও সে সব স্থানে ভারতবর্ষ, চীন, প্রভৃতি দেশ হ'তে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সমাগম হত ও বহু শাস্ত্রের গভীর আলোচনা চল্‌তো। স্থানীয় ভাষাগুলিতে বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদ হত—এই সব অনুবাদের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে—আর সেই সব অনুবাদই হচ্ছে প্রাচীন সুগ্‌দীয়, খোটানী, কুচীয়, তুখার প্রভৃতি ভাষার প্রথম ও একমাত্র সাহিত্য। মধ্য-এশিয়ায় প্রাচীন কালে যে সব লিপি চলিত ছিল তার মধ্যে ব্রাহ্মীই হচ্ছে প্রধান আর এ ব্রাহ্মী হচ্ছে Slanting Gupta অর্থাৎ গুপ্তলিপির একটী বিশেষ ধারা। খোটান অঞ্চলে খরোষ্ঠী লিপিও ব্যবহৃত হ'ত।

খোটান অঞ্চলে যে প্রাচীন কালে ভারতীয়দের উপনিবেশ ছিল তার প্রমাণ আছে। পূর্ব্বেই বলেছি যে এই প্রদেশে চলিত-ভাষা ছিল, ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের প্রাকৃত

ভাষা। খোটান ও তার নিকটবর্ত্তী নানা স্থানের রাজাদের নাম ছিল ভারতীয়।

মধ্য-এশিয়ার পুঁথি-পত্রের মধ্যে অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধ-শাস্ত্রের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এ আবিষ্কারের পূর্ব্বে বৌদ্ধ ত্রিপিটক পালি-ভাষা ব্যতীত যে অন্য কোন ভাষায় লেখা হয়েছিল সে ধারণা আমাদের ছিল না। কিন্তু মধ্য-এশিয়ার পুঁথি-পত্রের মধ্যে সংস্কৃত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম এই তিন পিটকেরই নানা খণ্ডিতাংশ পাওয়া গিয়েছে। এই সংস্কৃত ত্রিপিটক ছিল খুব সম্ভবতঃ সর্ব্বাস্তিবাদের আর এই সম্প্রদায়ের প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্র ছিল প্রথমে মথুরায় পরে কাশ্মীরে। যে সংস্কৃত ত্রিপিটকের খণ্ডিতাংশ পাওয়া গিয়েছে তা যে পালি-ত্রিপিটক থেকে অর্ব্বাচীন তা মনে করবার কোন কারণ নাই। বরং এ দুই ত্রিপিটকের তুলনামূলক আলোচনা করলে বুঝতে পারা যায় যে উভয়েই একটী মূল ত্রিপিটক থেকে উদ্ভূত, আর সেই সব চেয়ে প্রাচীন ত্রিপিটক লিখিত হয়েছিল মগধের প্রাচীন ভাষা—মাগধীতে। সে ত্রিপিটক এখন লুপ্ত হয়েছে—পালি ও সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে রয়েছে।

মধ্য-এশিয়ার নানা স্থানে যে সব ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে—তার আলোচনায় পণ্ডিতেরা বুঝতে

পেরেছেন যে তার পেছনে ছিল নানা শিল্পীসম্প্রদায়ের হাত। ভারতীয়, ভারতের উত্তর-পশ্চিমসীমান্তের ইন্দো-গ্রীক, মথুরা অঞ্চলের ইন্দো-শক, পারসিক ও চীনা শিল্পীসম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টায় প্রায় ১০০০ বছর ধরে মধ্য-এশিয়ার এই নানা স্থানে এই ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার সৃষ্টি হয়েছিল। আর এই ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া যায় আফগানিস্তানের বামিয়ান প্রদেশ হতে আরম্ভ করে, মধ্য-এশিয়ার দুটী প্রধান পথের উপর অবস্থিত নানা স্থান—চীনের পশ্চিম সীমান্তে 'তুন্ হোয়াং' ও উত্তর সীমান্তে 'লোংমেন'এর গুহা মন্দিরে, চীনের নানা স্থানে ও জাপানের হোরিয়ু-জি ও কোইয়া-সান্ মন্দিরে। শিল্পের প্রেরণা এসেছিল বৌদ্ধধর্ম্ম থেকে, আর শিল্পীরা হয়ত প্রথম দীক্ষা লাভ করেছিলেন ভারতীয়দের হাতে।

পূর্ব্বে যা বলেছি তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে মধ্য-এশিয়ায় অনুন্ধান কার্য্য এখনো শেষ হয় নি—বরং তা নূতন উৎসাহে চল্‌ছে। অনুসন্ধানের ফলে যে সব পুঁথিপত্র, ভাস্কর্য্য চিত্রকলা প্রভৃতির নিদর্শন সংগ্রহ করে ইউরোপের নানা স্থানে আনা হয়েছে সেগুলিই সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হয় নি। যে-টুকু হয়েছে তা দেখলেই স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তর সীমান্ত থেকে সুরু করে চীন দেশের

পশ্চিম সীমান্তে তুন-হোয়াং পর্য্যন্ত প্রাচীনকালে এক বিপুল সভ্যতা প্রসার লাভ করেছিল। এই সভ্যতার উপাদান ছিল—ভারতীয়, গ্রীক্, পারসিক, তুখারীয়, তুর্কী ও চীনা, আর বহুকাল ধরে সে সভ্যতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিল ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম। যে সব সমৃদ্ধিশালী নগরে ও যে সব ক্ষমতাশালী জাতির মধ্যে এ সভ্যতা পল্লবিত হয়ে উঠেছিল তাদের শুধু রয়েছে এখন ধ্বংসাবশেষ। এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নানা দেশের, ও বিশেষ করে ভারতের যে সব প্রাচীন রত্ন লুকিয়ে ছিল ইউরোপীর পণ্ডিতেরা তার উদ্ধার সাধন করেছেন ও করছেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টায় ভারতের স্থান কোথায়?

গ্রন্থসূচী

[এই গ্রন্থসূচী যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত। শুধু প্রধান গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও অনেক প্রবন্ধ ইউরোপের নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।]

I

Sir Aurel Stein—

1. Preliminary report on a journey of Archæological & Topographical Exploration in Chinese Turkestan, 1901

2. Sand-buried Ruins of Khotan, 1903
3. Ancient Khotan, 1907
4. Ruins of Desert Cathay, 1912
5. The Thousand Buddhas—ancient Buddhist paintings from the Cave temples of Tun huang 1921-1922
6. Serindia, 1921
7. A third journey of exploration in Central Asia 1913-16 (*Geographical Journal*, 1916)
8. Innermost Asia—its geography as a factor in history (*Geograph. Journal*, 1925)
9. Innermost Asia—detailed report of the third Central Asian Expedition.

Ed. Chavannes—Les documents Chinois decouverts par Aurel Stein dans les sables de Turkestan Oriental, 1913

F. W. Andrews—Ancient Chinese figured silks excavated by Sir Aurel Stein (*Burlington Magaz.*, 1920)

R. Petrucci—Les peintures Bouddhiques de Touen-houang, Mission Stein (Musée Guimet, 1914)

R. Hoernle—Manuscript-remains from Eastern Turkestan, I. (1914)

Boyer, Rapson and Sénart—Kharosthi Incsriptions discovered by Sir Aurel Stein in Chinese Turkestan (4 parts) 1920-27

F. W. Thomas—A long series of studies of the documents of Stein Collection in J.R.A.S. and *Acta orientalia*.

II

Gruenwedel—

1. Bericht ueber Archaeol. in Idikutshahri 1902-1903, Munich 1906
2. Altbuddhistische Kultstaetten in Chinesisch-Turkestan (Archaeol. Arbeit. 1906-1907 bei Kucha, Qarashar, und Turfan), 1912
3. Alt Kutscha, 1920

Von Le Coq—

1. Exploration archéologique à Tourfan—*J. As.* 1909
2. Chotscho, 1913
3. Volkskundliches aus Ost-Turkestan, 1916
4. Turkische Manichaica aus Chotscho 1911 1922
5. Die buddhistische spatantike in Mittelasien :
   - I. Die Plastik, 1922
   - II. Manichaische Miniaturen, 1923

III. Die Wandmalereien. 1924
IV. Atlas zu den Wandmalereine, 1924
V. Neue Bildewerke 1926
6. Bilderatlas zur Kunst und Kulturgeschichte Mittelasiens, 1925
7. Auf Hellas spuren in Ost-Turkistan, 1926
8. Kurze Einfuhrung in die Uigurische schriftkunde, 1919

Sieg und Siegling—

1. Tocharish., die sprache der Indoskythen. 1908
2. Tocharische sprachreste, 1921
3. Tocharische Grammatik, 1931

H. Lueders—

1. Ueber die litterarischen Funden in Ost-Turkestans, 1912
2. Geschichte und geographie Ost-Turkestans, 1922
3. Weitere Beitrage zur Geschichte und geographie von Ost-Turkestan, 1930
4 Das Sāriputraprakaraṇa ein Drama des Aśvaghoṣa, 1911
5 Kalpanāmaṇḍitikā des Kumāralāta

F. W. K. Mueller—

1. Tokhri und Kusan, 1918
2. Handschriftreste in Estrangeloschrift aus Turfan 1904-1905
3. Uigurica 1908—1911-1912

III

Paul Pelliot—

1. Mission en Asie Centrale, (*Bull.* de la Soc. de Geogr., 1908)
2. Rapport de M. Pelliot sur sa Mission, 1910
3. Trois ans dans la Haute-Asie (Asie Franc, 1910)
4. Une bibliothéque medievale retrouvée au Kansou (*BEFFO*, 1908)
5. Documents de la Mission Pelliot (Bull. arch. du Musée Guimet 1921)
6. Une bilingue sogdien-chinoise (Mélanges offerts à S. Lévi)-1911
7. Influences iraniennes en Asie centrale Rev. Hist. Litt. Releg., 1912)
8. Indian influences in the early Chinese Art in Tun-huang (Indian Art and Letters 1926)
9. Un fragment du Suvarṇaprabhāsasūtra en iranien-oriental (Mem. Soc. Ling. 1913)
10. Le Cha tcheou etc. (J. As. 1916)
11. Notes sur les anciens noms de Kuca, d'Aqsu et d'Uoturfan (T'oung Pao). 1923
12. Les Grottes de Touen-houang, 6 vols (Plates) 1920-1924—(other volumes to follow)

P. Pelliot and T. Haneda—

Manuscrits de Touen-houang, (in 2 series) Kyoto, 1936.

Ed, Chavannes and P. Pelliot—
Un traité Manicheen retrouvé en Chine (J. As. 1911-I2)

R. Gauthiot and P. Pelliot—Le Sūtra des causes et des effects du Bien et du Mal, 2 vols. 1920-1924

R. Gauthiot—
1. De l'alphabet Sogdien J. As. 1911
2. Noms de nombre en Sogdien (Mem. Soc. Ling. 1911-12)
3. Une Version Sogdienne du Vessāntara Jātaka J. *As*. 1912
4. Essai de grammaire sogdienne, I. 1914-1923 Benveniste—Essai de grammaire Sogdienne, II. 1928

Finot—
Prāimokṣasūtra des Sārvāstivādins *J. As.* 1913

J. Hackin—Formulaire Sanskrit—Tibetain, 1924

N. Chakravarti—L'Udānavarga Sanskrit (Mission Pelliot)

S. Lévi—
1. Etude des Documents Tokhariens de la Mission Pelliot with "Remarques Linguistiques" by A. Meillet—*J. As.*, 1911, pp, 431-464